হাতকাটা রবিন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ভূমিকা

তোমরা কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি, আমি কি বলব জান? আমি বলব, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ যে আমি বড় হয়ে গেছি! আমার চমৎকার শৈশবটি আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, আর কখনো আমি সেটা ফিরে পাব না।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল আমি যখন তোমাদের জন্যে লিখি হঠাৎ হঠাৎ আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া কৈশোর এসে আমার কাছে ধরা দেয়! মনে হয় আবার আমি ছোট হয়ে গেছি, তখন আমি উপন্যাসের চরিত্রদের সাথে মাঠে-ঘাটে, বনে-জংগলে ঘুরে বেড়াই, বিচিত্র সব এডভেঞ্চারে অংশ নিই, আর আমার বুকের ভিতরে আশ্চর্য এক ধরনের আনন্দ হতে থাকে।

এই বইয়ের উপন্যাসগুলি পড়ে তোমরা যদি আমার সেই আনন্দটুকু একটুখানিও অনুভব করতে পার আমার আর কিছু চাইবার নেই।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
পল্লবী, ঢাকা

নতুন ভাড়াটে

আমাদের পাশের বাসাটা অনেকদিন খালি পড়ে ছিল। গতরাতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। আগে এখানে মাসুদরা থাকত। মাসুদ ছিল আমাদের এক নাম্বারের বন্ধু। তাই মাসুদের আব্বা বদলি হয়ে চলে গেলে আমরা সবাই মনমরা হয়ে কয়েকদিন ঘুরোঘুরি করেছিলাম। তারপর আমাদের হাসপাতালটা উঠে গেল। (সে যে কি দারুণ একটা হাসপাতাল আমাদের ছিল!) আমাদের হাসপাতালে মাসুদ ডাক্তার, ওর আব্বা ডাক্তার কিনা, আর আমরা সবাই নার্স। মাসুদরা চলে গেলে ডাক্তারের অভাব হয়ে গেল। তাই হাসপাতালটাও উঠে গেল। আমরা কেউ বুঝতে পারিনি যে মাসুদ চলে যাবে তাহলে না হয় আমরা কেউ ডাক্তারিটা শিখে নিতাম— ওটা এমন কিছু কঠিন নয়।

মাসুদরা চলে গেলে ওই বাসায় যারা এসেছিল তাদের আব্বাও ডাক্তার। এটা সরকারী ডাক্তারের বাসা আর এখানে সবসময় ডাক্তার আসেন। আমরা ভাবলাম এ ছেলেটা হয়তো আমাদের ডাক্তার হবে, আমরা হাসপাতালটা আবার চালু করব। কিন্তু ছেলেটা মোটেই আমাদের সাথে কথা বলল না। বোনদের নিয়ে বারান্দায় বসে লুডু খেলত। আমাদের ফুটবল টিমে একজন কম পড়েছিল বলে তাকে কত ডাকলাম তা সে কিছুতেই এল না। ওদের একটা গাড়ি ছিল সেটাতে করে ঘুরে বেড়াত আর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাত যেন আমরা রাস্তার 'ছোঁড়া'! হীরা ঠিক করেছিল ওর মাথায় একদিন ঢিল মারবে, মেরেছিল কিনা কে জানে! ওটা যা পাজি! পরে আমাদের দেখলেই ওই ছেলেটা ঘরের ভিতরে চলে যেত। ওরা চলে গেলে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছিলাম।

আমি দেখেছি একবার কোনো বাসায় বন্ধু থাকলে, এর পরে যে আসে সে শত্রু হয়; এরপর আবার বন্ধু আসে। আমি নান্টু, হীরা, সলিল, মিশু ওদেরকেও এটা বলেছি, ওরা সবাই আমার কথা স্বীকার করেছে। মিশুরা যখন ঢাকায় থাকত তখন

নাকি এটা ওর এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে ওর বন্ধুরা চলে গেলে সে বাসায় যারা আসত তাদের সাথে সে কথাই বলত না, কারণ এ তো জানা কথা তারা ওর শত্রু হবে। এরপর শত্রুরা চলে গিয়ে আর কেউ আসলে ও আবার বন্ধু তৈরি করত। এটা নাকি ওর ভীষণ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

কাল রাতে যখন মাসুদদের বাসায় নতুন ভাড়াটে আসল তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবারে একজন বন্ধু পাব। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম– একটা ছেলেকে আবছা আবছা দেখেছি। আমি ঠিক জানি ও আমাদের বন্ধু হবে। তাই সকালবেলা আমরা এই বাসার সামনে ঘুরোঘুরি করছিলাম। তারপর আমরা বাসার সামনে বড় পেয়ারা গাছটাতে পা দুলিয়ে বসে থাকলাম। গাছটায় একটাও বড় পেয়ারা নেই সব খেয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে পাতার আড়ালে হঠাৎ করে বড় পেয়ারা পেয়ে গেলে আমরা সবাইকে এক কামড় করে খেতে দিই। হীরাটার কথা অবিশ্যি আলাদা, ও পেলে একলাই খায়।

অনেকক্ষণ ওই বাসাটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ আমাদের বয়সী একটা ছেলে তিন লাফে বেরিয়ে এল, তারপর আবার ঢুকে গেল। খানিকক্ষণ পর ছেলেটা একটা শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে আবার বেরিয়ে এল। ওকে দেখে আমরা এত অবাক হলাম যে গাছ থেকে নেমে ওকে ডাকার কথা ভুলে গেলাম। আমাদের সমানই হবে ছেলেটা, কাল হাফপ্যান্ট আর লাল ফুলশার্ট পরনে। শার্টটার বাম হাতটা কনুইয়ের পর গিঁট মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে— ওর হাতটা ওখান থেকে কাটা।

ছেলেটা এদিক সেদিক তাকাল তারপর আমাদের গাছে বসে থাকতে দেখে হেঁটে হেঁটে গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল, এক হাতে তরতর করে কি ভাবে জানি গাছটাতে উঠে মুখ কুঁচকে বলল, তোরা সব এ পাড়ার ছেলে? হ্যাঁ?

বিশ্বাস হতে চায় না, পরিচয় নেই কথাবার্তা নেই অথচ প্রথমেই ঠিক এই কথাটা বলল? আমরা ভীষণ অবাক হলাম। রাগ হলাম আরও বেশি। হীরা বলল, খবরদার, তুই তুই করে কথা বলবি না।

তুইও তো তুই তুই করে বললি! বলে ছেলেটা ফ্যাকফ্যাক করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, তোরা নিজেরা তুই তুই করে বলিস না?

হুঁ। আমি মাথা নাড়লাম। বলি তো কি হয়েছে?

তাহলে আমি বললে দোষ কি? আমিও তো এখানে থাকব।

ওর যুক্তিটা আমরা ফেলতে পারলাম না। বলতে কি উত্তরে বলার মত কিছু পেলামও না। তাই বলে খুব খুশি মনে যে ওকে স্বীকার করে নিলাম তা নয়। নেহায়েত হাতটা কাটা তাই একটু কৌতূহল হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার হাত কেটেছে কেমন করে?

কাটেনি।

তাহলে?

ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে। বলে সে কাটা হাতটা দুলিয়ে হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল।

বলো না শুনি।

বলব না। বলে এই আশ্চর্য ছেলেটা চুপ করে গেল। তারপর পা দোলাতে দোলাতে জিজ্ঞেস করল, তোরা দিনরাত গাছে বসে থাকিস?

আমি মুখ বাঁকা করে তাচ্ছিল্য করে ওকে উড়িয়ে দিলাম। বললাম, আমাদের ম্যালা কাজ। গাছে বসে থাকব কেন?

আজ যে বসে আছিস?

আজ যে ওর সাথে পরিচয় করার জন্যে বসে আছি সেটা তো আর বলতে পারি না! আমি তাই কোন উত্তর দিলাম না। বুঝতে পারলাম এ ছেলেটা ভারি পাজি হবে, আমাদের অনেক জ্বালাবে।

তোরা কি করিস? ছেলেটা আবার খোঁচাতে শুরু করল। মেয়েদের সাথে বুড়ী-চি খেলিস বুঝি? নাকি এক্কা দোক্কা? তারপর আবার হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগল।

দ্যাখ— নতুন এসেছিস বলে তোকে ছেড়ে দেবো ভাবিস না। আবার ওরকম খ্যাক খ্যাক করলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। হীরা অনেকক্ষণ সহ্য করে যাচ্ছিল, এবারে একটু ধাতানি দিল।

হাড় গুঁড়ো করে দিবি বুঝি? দে না— বলে সেই অবাক ছেলে হীরার কাছে এগিয়ে যায়।

হীরা হাড় গুঁড়ো করার কোন উৎসাহ দেখায় না। আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে পড়ে। সাথে সাথে আমরাও, বুঝতে পারলাম এই প্রথম আমাদের বন্ধুর পর শত্রু, শত্রুর পর আবার বন্ধু আসার নিয়মটা খাটল না। এবারে শত্রুর পর আবার শত্রু চলে এসেছে। আমাদের চলে যেতে দেখে ছেলেটা গাছ থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস?

আমরা উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

দাঁড়া, আমিও আসি— বলে এক হাতে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে সে দুই লাফে আমাদের কাছে চলে এল।

কথা বলছিস না যে?

হীরা গোঁ গোঁ করে বলল, তোকে কেউ ডাকছে না।

ছেলেটা না শোনার ভান করে পাশাপাশি হেঁটে যেতে থাকে। পথে একটা কুকুরকে ঢিল ছুঁড়ে ভয় দেখাল, একটা ছাগলের বাচ্চার পিছনের দুই পা ধরে খানিকক্ষণ দুই পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াল। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমরা কখনো ওর কথার উত্তর দিচ্ছিলাম, কখনো দিচ্ছিলাম না, ও মোটেই সেসব খেয়াল করছিল না। সত্যি কথা বলতে কি এই হাত কাটা ছেলেটাকে আমার খারাপ লাগছিল না আর এমন কৌতূহলী হয়ে উঠছিলাম যে বলার নয়।

নান্টুদের বাসার বাইরে আমরা এসে দাঁড়ালাম। ওদের বাসার বাইরের দিকে একটা ঘর সবসময় খালি পড়ে থাকত। আমরা ওটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে আমাদের হাসপাতাল খুলেছিলাম। হাসপাতাল উঠে যাবার পর আমরা যে সার্কাসের টিম খুলেছিলাম সেটার হেড অফিসও ছিল এখানে। এখন এখানে আমাদের ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস। হাত কাটা ছেলেটাকে এখানে নিয়ে এসে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠল। ঘরের বাইরে আমাদের সাইন বোর্ড (শফিক ভাই করে দিয়েছেন, উনি যা চমৎকার ছবি আঁকেন!) সাইন বোর্ডে লেখা, ' "প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি কোং" শার্লক হোমস অ্যাভিনিউ।' (আমরা এই এলাকাটাকে শার্লক হোমস অ্যাভিনিউ নাম দিয়েছি — পিয়নকে বলে দিয়েছিলাম শার্লক হোমস অ্যাভিনিউয়ে কোন চিঠি এলে যেন এ পাড়াতে নিয়ে আসে) ছেলেটা খুব মনোযোগ দিয়ে সাইন বোর্ডটি পড়ল। আমার সন্দেহ হল হয়ত এই ছেলেটা শার্লক হোমসকে চেনে না। তাই জিজ্ঞেস করলাম, শার্লক হোমস কে জান?

ছেলেটা ঠোঁট উল্টে বলল, খুব জানি। ওর সিনেমা পর্যন্ত দেখেছি।

আমি একটু দমে গেলাম। ভেবেছিলাম শার্লক হোমসের পরিচয় দেব, ওঁর সম্বন্ধে দু একটা কাহিনী বলব, আর নাচুনে পুতুলের গুপ্ত সংকেত যে আমরাও জানি সেটাও জানিয়ে দেব। কিন্তু ছেলেটা নাকি শার্লক হোমসের সিনেমাও দেখেছে!

আমি গম্ভীর হয়ে নান্টুকে বললাম তালাটা খোল তো। দরজায় একটা নাম্বার লক লাগানো, নাম্বার মিলিয়ে খুলতে হয়। নাম্বারটা আমরা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না। 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি কোং'র সব সদস্যদের প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করতে হয় কোন অবস্থাতেই তারা কাউকে এ নাম্বার জানাবে না। এই ঘরে আমাদের যাবতীয় গোপন তথ্য। আমরা তালা খুলে ভিতরে ঢুকে জানালা খুলে দিলাম। ভিতরটা দারুণ ভাবে সাজানো। একটা টেবিল, সামনাসামনি দুটো চেয়ার, একটা টুল, একটা বাক্স (অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই) ; দেয়ালে দুর্ধর্ষ ডিটেকটিভদের ছবি— শার্লক হোমস, জেমস বণ্ডেরও আছে। তাকে সেরা সেরা সব ডিটেকটিভ বই। বাংলাগুলো সবাই তিন চারবার করে পড়েছি, ইংরেজিগুলো বড় হয়ে পড়ব।

কি করিস এইখানে। ছেলেটা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

এটা আমাদের ডিটেকটিভ ক্লাব। এ পাড়ায় যত খুন ডাকাতি হয় সব আমরা খুঁজে বের করি।

ইহ্! ছেলেটা অবিশ্বাসের শব্দ করল।

বিশ্বাস করলি না? তুই রুনুকে জিজ্ঞেস করে দেখ, ওর আংটি হারিয়ে গেলে আমরা খুঁজে বের করে দিয়েছি কিনা!

ছেলেটা চুপ করে থাকল। রুনুর আংটি হারিয়ে গেলে আমরা সবাই সত্যি সত্যি খুঁজে বের করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের এতো ডিটেকটিভের বিদ্যে সেবার কাজে

লাগেনি। রুনু খেলতে খেলতে হারিয়ে ফেলেছিল, তাই বোঝাই যাচ্ছে ওটা মাঠে কোথাও পড়েছে। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে ফেললাম— অবিশ্যি কাউকে যখন গল্পটা বলি তখন এমন ভাব দেখাই যে ভীষণ মাথা খাটিয়ে ওটা বের করতে হয়েছে!

এরপরে অবিশ্যি আমাদের হাতে আর কোন কেস আসেনি। এ পাড়ায় একটাও খুন হয় না, এমন কি একটা বিড়ালও মারা যায় না। সেবার পল্টুদের একটা বিলাতী মোরগ মারা গেল। আমরা সবাই সন্দেহ করেছিলাম ওটা নিশ্চয়ই কোন অপরাধী মারাত্মক বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। আমরা যখন অপরাধীকে সন্দেহ করে প্রায় বের করে ফেলেছিলাম তখন জানা গেল আরেকটা মোরগ মারা গেছে, অন্যগুলিও ঝিমাচ্ছে। ওদের নাকি রানীক্ষেত রোগ হয়েছে। আমাদের তখন এতো মন খারাপ হল!

এরপর আমরা নিজেরাই একদল ডাকাত সেজে ডাকাতি করতাম অন্যেরা ডিটেকটিভ হয়ে খুঁজে বের করত। কিন্তু তাতে কি মজা লাগে? একটা খুন যে কেন হয় না বুঝি না।

বইটইগুলি দেখে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল তোদের ফুটবল ক্লাব নাই? আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলাম। সত্যি কথাটা বলতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল। ছেলেটা অধৈর্য হয়ে তার কাটা হাতের শার্টের হাতার বাড়তি অংশটা দিয়ে নান্টুর ঘাড়ে চাটি লাগাল — কি, নাই?

ছিল। ভেঙে দিয়েছি।

কেন?

বল নাই।

বল নাই? ছেলেটা একটু অবাক হল মনে হল। বলল, কিনিস না কেন?

কিনেছিলাম তো। সবাই চাঁদা তুলে কিনেছিলাম, কিন্তু ঝগড়া হবার পর সবাই চাঁদার পয়সা ফেরত চাইল।

তারপর?

পয়সা তো নাই — তাই বলটাকে কেটে নয় টুকরো করে সবাই এক টুকরো করে নিয়েছিলাম।

আমার ব্লাডারের টুকরোটা দিয়ে আমি গুলতি বানিয়েছি, এই দ্যাখ — বলে হীরা পকেট থেকে গুলতি বের করল তারপর চটাশ্ করে একটা গুলি জানালা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিল।

মনে হল এই প্রথমবারের মত ছেলেটার আমাদের প্রতি একটু সম্মানবোধ জেগে উঠেছে।

তোরা আর কি করিস?

আমাদের গুপ্তধন আছে। বলেই হীরা ঠোঁট কামড়ে চুপ করে গেল। আমরা আঙুল কেটে রক্ত বের করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কেউ এই গুপ্তধনের কথা বাইরের

কাউকে বললে সাথে সাথে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আমার হীরার জন্যে দুঃখ হল— হীরাকে এখন আমাদের মেরে ফেলতে হবে।

গুপ্তধন কি হয়েছে? ছেলেটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। হীরা অপরাধীর মত আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। আমরা কঠোর চোখে ওর দিকে তাকালাম।

কি হল? গুপ্তধন— বলে ছেলেটা শার্টের হাতার বাড়তি অংশটা দিয়ে আমার গালে চটাশ্ করে মেরে বসল। মনে হল গালটা ফেটে গেছে, আমি ক্ষেপে উঠে সাথে সাথে ওর ঘাড়ে ঘুষি মারলাম।

ছেলেটা ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে বিড়বিড় করে বলল, বেশি জোরে হয়ে গিয়েছিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, গুপ্তধনের কথা বললি না?

ওটা বলা যাবে না। নান্টু গম্ভীর স্বরে বলল, আমরা রক্ত শপথ করেছি— বলে সেও জিবে কামড় দিল। রক্ত শপথের কথা বললেও মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নিয়ম। নান্টুটাকেও মেরে ফেলতে হবে। আমাদের দুজন লোক কমে গেল।

ছেলেটা চোখ পিটপিট করে বলল, তোরা তাহলে বলবি না?

না। আমার অবিশ্যি ইচ্ছে করছিল ওকে বলতে। ওকে নিলে দলটা আরো ভাল হয়। দলে একজন হাত কাটা ছেলে থাকলে দারুণ রোমহর্ষক দেখায়।

বেশ। ছেলেটার মুখটা একটু ভারি দেখায়। তাহলে তোদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ভাবলাম তোদের পাড়ায় এসেছি যখন, তোরা নিশ্চয়ই আমার বন্ধু হবি, আমাকেও তোদের সাথে নিবি। তা তোরা যখন নিবি না, না নিলি। আমার মেকানো সেট ছিল, একশোটা থেকেও বেশি কমিক ছিল হেডফোন, ফুটবল সব ছিল ভাবলাম ওগুলো দিয়ে খেলব— একটা ফুটবল টিম খুলব! ছেলেটা বিষণ্ণ স্বরে বলল, তাহলে কিভাবে হাতটা কাটল তাও বলতাম! তা তোরা যখন আমাকে নিবিই না . . .।

আমরা ভেবে দেখলাম ও যদি হাত কাটার গল্প বলে তাহলে ওকে গুপ্তধনের কথা বলা যায়। ও যখন এখানেই থাকবে, ফুটবল দেবে, ফুটবল টিম খুলবে, ওকে আমাদের দলে নিয়ে নিলে ক্ষতি হবে না। বরং অন্য সব পাড়ার ছেলেরা হিংসা করবে, ওদের তো কারো হাত কাটা ছেলে নেই।

আমরা ওকে বললাম পিন ফুটো করে রক্ত বের করে স্বাক্ষর করতে হবে— তাহলেই ওকে দলে নিয়ে নেব। ও রাজি হল। দরজা বন্ধ করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওকে আমাদের গোপন ব্ল্যাক মার্ডার দলে নিয়ে নিলাম। তারপর গুপ্তধনের ম্যাপ দেখালাম গুপ্তধনে কি কি আছে তাও বললাম। এরপর ওর অনেক রকম কসম খেতে হল। এরপরেও সে যদি কিছু ফাঁস করে দেয় তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই— কারণ ইহকালটাই তো শেষ নয় পরকালও আছে। পরকালে কে শয়তানের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে চাইবে? কসম খাওয়ার সময় প্রথমেই খোদার নাম নিয়ে বলতে হয়, 'কিছু ফাঁস করে দিলে আমি শয়তানের ক্রীতদাস, নরক আমার স্থান।'

তারপর সবাই গোল হয়ে বসলাম। আমি বললাম, এবারে বল তোর হাত কি করে

কাটল?

তার আগে বল আমাকে তোদের সর্দার বানাবি।

ইহ্! আমরা হৈ হৈ করে উঠলাম, সর্দারের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাহলে কিভাবে হাত কেটেছে বলব না। ছেলেটা মুখ কঠোর করে বসে রইল। আমরা সবাই ভীষণ ক্ষেপে উঠে ওকে যা ইচ্ছে তাই বলে গালিগালাজ করলাম। এমন নিমকহারাম কেউ কোনদিন দেখেনি।

বেশ। ছেলেটা মুখ শক্ত করেই বলল, আমাকে তাহলে সর্দার বানাবি না?

না।

তোদের সর্দার কে?

হীরা আমার মুখের দিকে, আমি হীরার মুখের দিকে তাকালাম। আমাদের দুজনের ভিতরে একজন হবে কিন্তু কে এখনও ঠিক করা হয়নি।

তোদের যে সর্দার তার সাথে মারামারি করব। যে জিতবে সে সর্দার হবে। এ ছাড়া হাত কাটার গল্প বলব না।

প্রস্তাবটা খারাপ না, কারণ ছেলেটার সাথে জিতে ওঠা কঠিন হবে না। একটা মাত্র হাত, ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে কঁ্যাক করে ঘাড়টা আঁকড়ে ধরলেই হলো।

ঠিক আছে। আমি রাজি হলাম।

ঠিক হ্যায়। হীরাও রাজি হল।

আজ বিকালেই?

হঁ্যা, আজ বিকালেই।

ছেলেটা খুশি হয়ে সবার মুখের দিকে তাকাল তারপর শার্টের হাতার বাড়তি অংশটা দিয়ে নিজের গালে চটাশ্ করে মেরে বসল! এমন অবাক ছেলে।

তাহলে শোন, কিভাবে হাত কাটল। ছেলেটা গল্প শুরু করল। বছর দুয়েক আগে জীপ অ্যাকসিডেন্টে কিভাবে ওর হাত থেঁতলে গিয়েছিল, না কেটে উপায় ছিল না। সেই গল্প শুনতে শুনতে আমাদের দম বন্ধ হয়ে এল।

এক সময় মিশু শিউরে উঠে বলল, ইশ!

ছেলেটা চোখ বড় বড় করে বলল তোরা যদি দেখতি — আমার দুটো আঙুল কেটে মাটিতে পড়ে টিকটিকির ল্যাজের মতো তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছিল!

যাঃ!

হঁ্যা। ছেলেটা জোর দিয়ে বলল। তারপর অনেকদিন স্কুলে যেতে হয়নি। হাসপাতালে ছিলাম। তাতেই এক বছর নষ্ট হয়ে গেল। তোরা কোন্ ক্লাসে পড়িস?

আমি সেভেনে, নান্টুও সেভেনে, হীরা সিক্স।

ছেলেটা খুশি হল। নিচের ক্লাসে হলে ওর সর্দার হওয়া একটু কঠিন হবে কিনা।

আরও খানিকক্ষণ গল্প করে আমরা বাসায় চলে এলাম। দুপুর হয়ে গিয়েছিল। আসার সময় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক নামটা কি?

হাকার-বিন।

মানে?

মানে হাত কাটা রবিন। বলে সে হিঃ হিঃ করে হাসল।

হাত কাটা রবিন

আমি বাসায় গিয়ে সবাইকে হাত কাটা রবিনের গল্প বললাম। ছেলেটিকে যে আমার পছন্দ হয়েছে তা গল্প করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম। সত্যমিথ্যা এক গাদা জিনিস বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলাম। আম্মা বললেন, নিয়ে আসিস তো ছেলেটাকে একদিন।

বিকেল হওয়ার অনেক আগে আমি আমাদের ডিটেকটিভ ক্লাবে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি সবাই আগে পৌঁছে গেছে, এমন কি রবিনও। হীরা, নাণ্টু, মিশু, সলিল সবাই মিলে একটা মাঝারি সাইজের ফুটবল পাম্প করছে। বলটা রবিনের। রবিন কাটা হাতটা দিয়ে এমন চমৎকারভাবে পাম্পারটা ঠেসে ধরে পাম্প করে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল হাত কাটা থাকলেই বুঝি এসব কাজ করতে সুবিধা।

দারুণ একটা ফুটবল টিম খুলব। বলের লেসিং লাগাতে লাগাতে রবিন বলল, পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ভাল।

আমরা রোমাঞ্চিত হলাম। সলিল বলল, ঠাকুরপাড়ার টিমটা খুব শক্ত। গতবার চার গোল খেয়েছি, তার আগেরবার ছয় গোল।

রবিন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা দিনরাত মেয়েদের মত বুড়ী-চি খেলিস, ফুটবল খেলায় তো গোল খাবিই।

ইহ্। বুড়ী-চি খেলি কে বলল তোকে? মারব থাবড়া— হীরা বাতাসের মাঝে ঘুষি মারল।

ঐ হল। ফুটবল কেটে কেটে ভাগ করে নিস, ফুটবল খেলিস না। তার মানেই বুড়ী-চি খেলিস।

আবার? আবার? হীরা দাঁত কিড়মিড় করে।

ফুটবলটি মাটিতে তিন চারবার ড্রপ দিয়ে রবিন বলল, চল খেলি গিয়ে।

আমরা হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলাম। মাঠের ধারে গোল হয়ে বসে টিম ভাগ করতে লাগলাম। আমাদের মাঝে সলিল আর মিশু দারুণ খেলতে পারে। হীরাটার পায়ে জোর বেশি, ল্যাং মেরে টেনে হিঁচড়ে বল নিয়ে যায়, আসলে বেশি ভাল খেলতে পারে না। রবিন কি রকম খেলে কে জানে, তবে ওর যে রকম উৎসাহ, নিশ্চয়ই ভাল খেলে।

আমাদের সর্দার হবার মারামারিটা তার আগে হয়ে যাক। রবিন বলের উপর এক পা তুলে কাটা হাতটা নাচাতে নাচাতে বলল। অনেকক্ষণ ধরেই অস্বস্তির সঙ্গে আমার

একখাটা মনে হচ্ছিল। হীরা গোঁ গোঁ করে বলল, ঠিক আছে। তারপর হাতা গুটিয়ে ফেলল। আমরা গোল করে জায়গা করে দিলাম।

রবিন শার্ট খুলে গেঞ্জি বের করে নিল। তারপর হীরার দিকে এগিয়ে এল। বলল আয়।

হীরা তার জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল, তুই আয়।

আমি দেখেছি যেসব মারামারি হঠাৎ করে কোন কারণে শুরু হয়ে যায় সেগুলি চমৎকার চলতে থাকে। কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে খুব ধীরে ধীরে মারামারি শুরু করা দারুণ শক্ত। হীরা আর রবিন খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একজন আরেকজনের বুকে থাবা দিয়ে ফোঁসফোঁস করছিল। রবিন মাঝে মাঝে ঠেলে হীরাকে সরিয়ে দিচ্ছিল, হীরাও ঠেলে রবিনকে সরিয়ে দিচ্ছিল।

লেগে দেখ না ! ছাতু বানিয়ে ফেলব। হীরা গরম হয়ে রবিনকে একটা মাপসই ধাক্কা দেয়।

ইহ্! রবিন ঝটকা মেরে হীরার হাত সরিয়ে দেয়। বলে, কি করবি তুই? কাঁচকলা ! তারপর কাটা হাতটা দিয়ে থুতনিতে টোকা মারে।

আরেকবার মার তো !

রবিন আরেকবার মারল, একই জায়গায় ঠিক একই ভাবে।

আরেকবার মেরে দ্যাখ তো। হীরার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। রবিন আবার ঠিক একই জায়গায় একই ভাবে মারল। সাথে সাথে হীরা রবিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি বুঝতে পারলাম রবিনের গায়ে দারুণ জোর। হাতটা কাটা থাকার পরও সে হীরাকে এমন বেকায়দাভাবে ল্যাং মেরে ফেলে দিল যে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। দুজন দুজনকে খামচে, ঝাঁপটে, ঘষটে ঘষটে ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগল। কখনও হীরা রবিনকে কাবু করে ফেলছিল কখনও রবিন হীরাকে। অনেকক্ষণ ধরে ওদের ঝাপটাঝাপটি চলল, শেষ পর্যন্ত আমরাই বিরক্ত হয়ে ওদের ছাড়িয়ে দিলাম। দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার পর ওরা দুজনেই দাবি করতে লাগল যে সে জিতেছে। হীরার সাথে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার সাথে মারামারি শুরু হতে পারে না তাই ওটা আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকল। এখন ফুটবল খেলব।

কিন্তু ফুটবল কোথায়? খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে দেখি আমাদের ছোট ভাইয়ের দলটা ওটাকে দমাদম পিটিয়ে বাসার উঠনে খেলছে। রঞ্জুর কান মলে দিয়ে আমি বলটা নিয়ে এলাম। রঞ্জু, আমার ছোট ভাই, ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল। আজ বাসায় এ নিয়ে ভোগান্তি হবে !

আমি বল নিয়ে এলাম, দল ভাগ করা হল, এক দিকে সলিল ক্যাপ্টেন আরেক দিকে রবিন। রবিন বলল ওকে ক্যাপ্টেন না বানালে সে খেলবে না, বল নিয়ে চলে যাবে। এমন বিচ্ছু ছেলে আমি আর দেখিনি।

ওকেই ক্যাপ্টেন করা হল। বলের মালিককে সব সময় একটু সুবিধা দিতে হয়।

আর মালিক যদি রবিনের মত নচ্ছাড় ঝান্দা হয় তাহলে তো বটেই।

খেলা শুরু হল। সবাই দমাদম কিক মেরে বলটাকে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ছোটাতে লাগল। সলিল আর হীরা মিলে আমাদের দুটো গোল দিয়ে দিল। আমি গোলকীপার। রবিন এসে আমাকে বলল, আরেকবার গোল হলে চোখ কানা করে দেব।

আমিও তেরিয়া হয়ে বললাম, যদি গোল শোধ করতে না পারিস বাকি হাতটাও কেটে নেব। রবিন আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বলের পিছে পিছে ছুটল। নান্টুকে বলে কয়ে গোলকীপার তৈরি করে আমি মাঠের মাঝে চলে এলাম। দমাদম কিক মেরে বল কেটে বের করে নিয়ে এসে গোল পোস্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, রবিনও জায়গামত আছে এমন সময় হীরা পিছন থেকে এসে আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল। বল নিয়ে ছুটে গিয়ে আমাদের আরেকটা গোল দিয়ে দিল। নান্টু গোলকীপার হিসেবে একেবারে যাচ্ছেতাই!

ঘেমে টেমে আমরা অস্থির। একেকজন লাল হয়ে হাঁপাচ্ছি। তিনটি গোল খেয়ে রবিনের চেহারা হয়েছে ভয়ঙ্কর। হীরাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সলিলকে পাশ কাটিয়ে সে দারুণ ভাবে খেলতে লাগল। গোল পোস্টের কাছে এসে বলটাকে সামলানোর জন্যে তার কাটা হাতটা দিয়ে হঠাৎ করে বলটাকে থামিয়ে নিল, তারপর এক কিকে গোল।

ততক্ষণে সলিল, হীরা ওরা তুমুল হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে। হ্যাণ্ডবল হ্যাণ্ডবল করে চেঁচিয়ে দাপাদাপি শুরু করেছে।

রবিন মুখচোখ লাল করে বলল, হ্যাণ্ড নেই আবার হ্যাণ্ডবল কিসের?

যতটুকু আছে ততটুকুই হ্যাণ্ড।

ইশ! রবিন মুখ খিচিয়ে বলে, কনুই পর্যন্ত আছে, ওটাকে আর্ম বলে। ওখানে লাগলে হ্যাণ্ডবল হয় না।

আমি তারস্বরে চেঁচিয়ে রবিনকে সমর্থন করে যেতে লাগলাম। ভাব দেখে মনে হল বিকেলের অর্ধ সমাপ্ত মারামারিটা এবারে ব্যাপক ভাবে শুরু হয়ে যাবে। নান্টু তখন শফিক ভাইয়ের কাছে যাওয়ার বুদ্ধি দিল। কথাটা ঠিক, আমাদের এতক্ষণ মনে হয়নি। আমরা খেলা বন্ধ করে দল বেধে শফিক ভাইয়ের কাছে চললাম। হীরা আর রবিন তখনও ঝগড়া করে যাচ্ছে।

আমাদের সবার বাসা পাশাপাশি। বাসার সামনে তখন মেয়েরা লুকোচুরি খেলছিল। আমাদের দলটাকে আসতে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। একটু পরে বুঝতে পারলাম ওরা রবিনকে লক্ষ্য করছে। হাতটা কি চমৎকার ভাবে কাটা! আমার হিংসে হতে লাগল।

শফিক ভাই বাগানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। তার লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার একটা আলাদা জায়গা আছে। আমাদের দেখে বললেন, ব্ল্যাক মার্ডারের খবর কি?

আমাদের এত তীক্ষ্ণ গোপনীয়তার পরেও কিভাবে যে দলের নাম ফাঁস হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম না। শফিক ভাইয়ের কথা না শোনার ভান করে আমরা আমাদের

বাধন্যাটা খুলে বললাম। তিনি রবিনকে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, ঠিক করে বল তো বলটা হঠাৎ এসে লেগেছে না ইচ্ছে করে লাগিয়েছ?

রবিন গাঁই গুই করে পিছে সরে এল। এমন গাধা ছেলে, যখন একটু মিছে কথা বললেই ঝামেলা মিটে যায়, তখন মিছে বললেই হয়। হীরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে বলল, ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে লাগিয়েছে।

তাতে কি হয়েছে? রবিন ফোঁস করে উঠল। আমার হাত তো কাটা, বল লাগলে হ্যান্ডবল হবে কেন?

কিন্তু তাই বলে তুমি ইচ্ছে করে বল হাত দিয়ে থামাবে? তোমার কাটা হাতের সুযোগ নেয়াটা তো অন্যায়।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দোষ রবিনের। রবিন ফোঁসফোঁস করে দোষ মেনে নিল। আমরা বল নিয়ে ফিরে যেতে লাগলাম। দেখি মেয়েরা তখনো খেলা বাদ দিয়ে আবার ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। সত্যি এমন হাত কাটা ছেলে কয়টা পাওয়া যায়? রবিনের জন্যে তখন আমাদের গর্ব হতে লাগল।

এই ছেলেরা! শুনে যাও— হঠাৎ ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি শিরি আপা। আমরা ছুটতে ছুটতে শিরি আপার কাছে হাজির হলাম। রবিন নতুন এসেছে জানে না শিরি আপা এল। ডাক দেয়া মানেই চিনেবাদাম না হয় লজেন্স খাওয়ানোর জন্যে ডাক। তাই সে এল সবার পিছে পিছে হাঁটতে হাঁটতে। কিন্তু দেখা গেল শিরি আপার কৌতূহল রবিনকে নিয়েই।

তোমরা নতুন এসেছ বুঝি?

জ্বী।

নাম কি তোমার?

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

আমরা জানিয়ে দিলাম ওর আসল নাম হাকার-বিন ওরফে হাত কাটা রবিন।

কয় ভাইবোন তোমরা?

তিন।

কোন্ ক্লাসে পড়?

সেভেনে।

দেখা গেল রবিন আমাদের সাথেই ওরকম কাঠ গোঁয়ার, শিরি আপার সামনে দিব্যি ভদ্র ছেলেটি। একটু পরেই শিরি আপা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে কি হয়েছিল?

রবিনকে একটু অসহিষ্ণু দেখা গেল। বলল, কেটে ফেলেছে।

কি ভাবে?

রবিন ঘটনাটা বর্ণনা করল— অনেক কম কথায়। কাটা আঙুল দুটি যে টিকটিকির ল্যাজের মত লাফাচ্ছিল ঐ কথাটা পর্যন্ত বাদ দিয়ে গেল।

শিরি আপা শুনে জিহ্বা দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন। রবিন উসখুস করে উঠে

আমাদের বলল, চল যাই।

আমরা শিরি আপার লজেন্সের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। দেখা গেল শিরি আপার সে রকম কোন পরিকল্পনা নেই। কেমন করে জানি রবিনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমরা হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলাম। তিন পা যেতে না যেতেই সলিলের আম্মা ডাকলেন, সলিল ! তোরা শুনে যা —

আবার রবিনকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার নাম কি? কোন্ ক্লাসে পড় এই সব। তারপর তোমার হাত কি করে কাটল?

রবিন আবার গড়গড় করে বলে গেল। আহা উহ করার সময় আমরা বেরিয়ে এলাম। কিছুদূর না যেতেই আবার ডাক, এবার নান্টুর বড় ভাই !

আমরা নান্টুর ভাইয়ের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে এক ছুটে একেবারে মাঠে হাজির হলাম। এত তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসেছি যেন আর কেউ ডাকতে না পারে। রবিন হাঁপাতে হাঁপাতে মুখ খিঁচিয়ে বলল, আমি মোটমাট তিন লক্ষ বার বলেছি হাত কি ভাবে কেটেছে ! কারো সাথে দেখা হতেই ··· রবিন কাকে কি যেন একটা গালি দিল।

আবার খেলা শুরু হল। দমাদম কিক মারতে লাগলাম, দুদ্দাড় আছাড়ে পড়তে লাগলাম, আর বল নিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। রবিন দারুণ খেলে গেল। ওরা আর একটা গোলও দিতে পারল না — উল্টো আমরা একটা গোল শোধ করে দিলাম।

খেলা শেষ হলে আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে বলকে ঘিরে বসে রইলাম। গেঞ্জি খুলে বাতাস করতে করতে সলিল প্রস্তাব দিল, চল গোসল করে আসি।

রবিন জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে?

নদীতে। আমি রবিনকে বুঝিয়ে দিলাম, একটু দূরেই নদী, ঝকঝক করছে পানি। সাঁতার জানিস?

জানতাম।

ভুলে গেছিস? বলে আমরা খিলখিল করে হাসতে লাগলাম সাঁতার কেউ কখনও ভোলে?

দাঁত কিড়মিড় করে রবিন বলল, ভুলিনি, হাত কেটে ফেলার পর আর সাঁতরাইনি। কাটা হাত নিয়ে সাঁতরানো যায়?

আমরা অপ্রস্তুত হলাম ! একথাটা আগে চিন্তা করিনি। এই প্রথম দেখা গেল হাত কাটা থাকার কিছু কিছু অসুবিধেও আছে।

বিকেলে গোসল করা ঘোরতর বেআইনী। তাই তোয়ালে সাবান এসব না নিয়ে যে যেভাবে আছি সে ভাবেই আমরা নদী তীরে রওনা দিলাম। ভোঁ ভোঁ করে আমাদের গাড়ি ছুটল, একজনের থেকে আরেকজনের গাড়ির জোর বেশি। হর্নের শব্দে কান

পাতা দায়।

ঠাকুরপাড়া শুরু হতেই আমরা ভদ্র হয়ে গেলাম। এদের ফুটবল টিমটা দারুণ। ছেলেগুলোও ভীষণ মারপিট করনেওয়ালা। হীরা দুবার ওদের কাছে মার খেয়েছে।

দেখা গেল ভীষণ চেঁচিয়ে হৈ হল্লা করে ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা কিংকুইন খেলছে। আমাদের দেখে হুই হাই করে কয়েকটা চিৎকার দিল। তারপর একজন টেনিস বলটা হাতে নিয়ে সাঁ করে সলিলের ঘাড়ে মেরে বসল।

আমরা তবু চলে এলাম। ভিন্ন পাড়া দিয়ে যেতে হলে একটু অত্যাচার সহ্য করতেই হয়। রবিন সলিলকে বলে, তুই কিছু বললি না? তোকে এভাবে মারল?

আসুক না আমাদের পাড়ায়! সলিল চোখ পাকিয়ে বলল, পুরো ফুটবলটা ওর পিঠে ফাটাব।

নদীর তীরে অনেক দূর বালুর চড়া। কিছু কিছু লোকেরা ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছে, রঙিন কাপড় পরনে হাসিখুশি চেহারার লোক। কয়েকটা নৌকা ছাড়া ছাড়া ভাবে এদিকে সেদিকে বাঁধা আছে। মাঝিরা ভাত চড়িয়ে গলুইয়ে চুপচাপ বসে আছে। আমরা হৈ হৈ করতে করতে ছুটতে ছুটতে কাপড় খুলতে খুলতে নদীর তীরে পৌঁছালাম তারপর ঝপাং করে নদীতে লাফিয়ে পড়লাম। দুটো ডুবে নদীর মাঝামাঝি এসে দেখি রবিন মুখ শক্ত করে তীরে দাঁড়িয়ে আছে। নদীতে নামছে না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, নেমে পড়। কিচ্ছু হবে না।

রবিন অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার কেন জানি হঠাৎ করে ওর জন্যে ভীষণ মায়া হল। সাঁতরে তীরে এসে ওকে ডাকলাম, রবিন, এখানে নেমে আয় দ্যাখ, মাত্র বুক পানি। তুই নাম কিচ্ছু হবে না— আমরা পাহারা দিচ্ছি।

রবিন ওস্তাদ সাঁতারুর মত পানিতে নেমে এল। বোঝা গেল হাত কাটার আগে ও পানির পোকা ছিল। আমরা সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়ালাম, আর সে সাঁতরাতে চেষ্টা করল। দেখা গেল সে এখনও সাঁতরাতে পারে ঠিকই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি দম ফুরিয়ে যায়।

ঠিক হয়ে যাবে। রবিন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাসায় ফেরার সময় আমাদের সবার বুক দুরুদুরু করতে থাকে। ভিজে কাপড়ে বাসায় যাওয়া মানে আম্মার চড় কানমলা আর বকুনি। কাপড় যে খানিকক্ষণ ঘুরে শুকিয়ে নেব, তারও উপায় নেই — অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তার বাতি এর মাঝে জ্বলে গেছে। রবিনের কিন্তু ওসব কোন দিকে খেয়াল নেই, ও শুধু খবর নিতে লাগল আশেপাশে কোন্ ফুটবল টিম কতটুকু শক্ত, আমরা যদি ফুটবল ক্লাব খুলি তাহলে

সবার সাথে জিততে পারব কি না। একটা ট্রফির দাম কত, ট্রফির খেলা দিলে খেলা কেমন জমবে, এই সব!

তখন দ্রুত সন্ধ্যা হয়ে আসছে আমরা শুকনো মুখে বাসায় ফিরে যেতে লাগলাম। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে গেছে। অর্থাৎ আজ শুধু বেআইনী গোসল করার অপরাধ নয় তার সাথে দেরি করে ফেরার মাশুলও দিতে হবে। আজ আর রক্ষে নেই।

স্পুটনিক বয়েজ ক্লাব

হুড়বড় করে ভাত খাচ্ছিলাম। আম্মা বললেন, সারাদিন কি করিস? ভাতটা পর্যন্ত ধীরে সুস্থে খেতে পারিস না?

একদলা ভাত অর্ধেক চিবিয়ে গিলে ফেলে বললাম, সবাই অপেক্ষা করছে, খেলতে হবে না!

এই মাত্র না আসলি স্কুল থেকে?

আমি আর বৃথা তর্ক করলাম না। এই মাত্র স্কুল থেকে এলে কি খেলতে যাওয়া যায় না? কিন্তু আম্মাকে সেটা কে বোঝাবে?

স্কুলের জামা কাপড় বদলে একটা কালো হাফ প্যান্ট পরে আমি এক ছুটে মাঠে এসে হাজির হলাম। সেখানে কেউ নেই দেখে আমি গেলাম আমাদের ডিটেকটিভ ক্লাবে। সেখানে দেখি ভীষণ ধুমধড়াক্কার সাথে বল পাম্প করা হচ্ছে। প্রতিদিন টাটকা পাম্প করে নাকি খেলার নিয়ম।

রবিন পাম্প শেষ করে বলল, চল আমরা অন্য পাড়ার সাথে একটা ফুটবল খেলা দিই।

চল! আমরা সবাই এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলাম। শুধু সলিল মুখ সূচালো করে বলল, কিন্তু ঠাকুরপাড়ার সাথে হেরে যাব!

কখখনো না! রবিন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। আজ থেকে আমরা প্র্যাকটিস শুরু করব।

সত্যি সত্যি প্র্যাকটিস শুরু করা হল। আমার উপর জোর দেয়া হল সবচেয়ে বেশি। ভাল গোলকীপার থাকলে নাকি খেলায় অর্ধেক জেতা হয়ে যায়। ওরা সবাই আমার সামনে থেকে দমাদম কিক মেরে গোল দেয়ার চেষ্টা করছিল আমি লাফিয়ে কুদিয়ে সেগুলি ধরার চেষ্টা করছিলাম। একেকবার একেকটা বল হাতের ফাঁক দিয়ে চলে যাচ্ছিল অমনি সবাই চেঁচিয়ে উঠছিল 'গো-ও-ল!' আবার যখনি একটা মারাত্মক বল ধরে ফেলছিলাম তখন ওরা 'সাবাশ' 'সাবাশ' বলতে দ্বিধা করছিল না।

এরপর ওরা নিজেরা একজন আরেকজনকে বল পাস করা শিখতে লাগল।

দাঁড়িয়ে থেকে পাস, দৌড়াতে দৌড়াতে পাস, সামনে থেকে পাস, পিছন দিকে পাস, হাজারো রকমের কায়দা! খেলতে খেলতে একসময় বেলা শেষ হয়ে এল, আমরা ঘেমে একাকার। বসে থেকে বিশ্রাম নিতে নিতে মনে হল কোন পাড়ার সাথে ফুটবল খেলা দেয়ার জন্যে এখনই গিয়ে আলাপ করে রাখা ভাল। আমরা তখনই সূত্রাপুর রওনা হলাম। ওদের একটা ফুটবল ক্লাব আছে। ওদের দলটাকে খুঁজে পেতে খুব দেরি হল। বাজারের পাশে নোংরা একটা মাঠে কাদা মেখে ওরা হা-ডু-ডু খেলছে। ওদের ভিতরে যে ছেলেটা মোটামুটি নেতা সে অন্য স্কুলে, তবে আমাদের সাথেই পড়ে। নাম মঞ্জু। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের সাথে ফুটবল খেলা দিতে রাজি আছে কি না। একটুও চিন্তা না করে সে বলল, না।

কেন? খেলবি না কেন?

আমাদের বল নেই।

আমাদের আছে। আমি বলটা দেখালাম, এটা দিয়ে খেলব।

আমরা অন্যের বল দিয়ে খেলি না। এই বলে সে একটা চোরা কাটা তুলে চিবুতে লাগল। একটু পরে বলল, আমাদের সাথে হা-ডু-ডু খেলবি?

নাহ্! আমি রবিনকে দেখালাম। দেখছিস না হাত নেই?

অ। মঞ্জুকে এবারে একটু কৌতূহলী দেখা গেল। রবিনকে দেখিয়ে বলল, তোদের সাথে এও খেলবে নাকি?

খেলব মানে? আমিই তো ক্যাপ্টেন! বলে রবিন বুকে ছোট্ট একটা ঘুষি মারল। রবিন এমন হঠাৎ করে নিজেকে ক্যাপ্টেন বলে বসল যে আমরা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম, একটু প্রতিবাদও করতে পারলাম না। তাছাড়া অন্য পাড়ার সামনে এসব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করলে সম্মান থাকে না। হীরা তবু চোখ পাকিয়ে বলল, ইস্!

মঞ্জু হীরার কথাটা ঠিক শুনতে পেল না।

খানিকক্ষণ রবিনকে লক্ষ্য করে মঞ্জু হঠাৎ করে কেন জানি খেলতে রাজি হয়ে গেল। বলল, কোন্ দিন খেলবি?

কাল?

না। কাল আমাদের হা-ডু-ডু খেলা আছে। পরশু, ঠিক আছে।

দিন তারিখ সময় ঠিক করে আমরা ফিরে এলাম। মঞ্জুর সাথে অনেকগুলি শর্ত ঠিক করে এসেছি। কোন দল হেরে গেলে তাকে দুয়ো দেয়া যাবে না। ফাউল হয়ে গেলে মারামারি করা যাবে না। রেফারীর কথা শুনতে হবে— এই সব।

পরের দিন আমরা খুব প্র্যাকটিস করলাম। যে দিন খেলা সেদিন সকাল সকাল মাঠে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওরা আসল দেরি করে। খেলা শুরু করার সময় দেখা গেল একজন খেলোয়াড় কম। ওদের সাথে খেলা দেখতে এসেছিল এমনি একজন লুঙ্গি মালকোচা মেরে খেলতে নেমে গেল।

খেলা শুরু হওয়ার পর দেখা গেল ওরা কিচ্ছু খেলতে পারে না। আধ ঘণ্টার ভিতর

ওরা চারটে গোল খেয়ে গেল। আমি গোল পোস্টে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেলাম, একটা বলও ওরা কাছে আনতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ওরা হয় মাইনাস। আবার সবাইকে নিয়ে দল ভাগ করে খেলা হল। মোটকথা প্রথম খেলাটা একটা যাচ্ছেতাই দলের সাথে খেলে জিতে গেলাম।

এরপর থেকে রবিন ঠাকুরপাড়ার টীমের সাথে খেলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। এখন ওদের সাথে খেললেই হেরে যেতে হবে। ওদের সবগুলো খেলোয়াড় বড় বড়, সব ক্লাস নাইন টেনে পড়া ছেলেপেলে। একজন আবার আমাদের স্কুলের টীমে খেলে !

তবে আমরা আমাদের ছোট শহরের সবগুলো টিমের সাথে খেললাম। একটা টিম ড্র করেছে, পরে আর খেলতে রাজি হয়নি, একটা টিম মারামারি করে খেলা ভণ্ডুল করেছে, এ ছাড়া অন্য সব কয়টা খেলায় জিতে গেছি। বলতে কি আমাদের টিমটার বেশ নাম হয়ে গেল। একদিন আমি নিজের কানে শুনেছি দুটো ছেলে বলতে বলতে যাচ্ছে, স্পুটনিক বয়েজ ক্লাব সবচেয়ে ভাল ফুটবল খেলে। ওদের ক্যাপ্টেনের হাত কাটা, সে মাঠের যেখান থেকে ইচ্ছে দাঁড়িয়ে গোল দিতে পারে।

আমাদের ক্লাবটার নাম স্পুটনিক বয়েজ ক্লাব। নামটি দিয়েছে নান্টু। ও আবার এসব খুব ভাল পারে। আমাদের ডিটেকটিভ ক্লাবের নাম প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি কোং, আর গোপন দলের নাম ব্ল্যাক মার্ডার সব কয়টা নাম নান্টু দিয়েছে। খুব গল্পের বই পড়ে তো ! যাই হোক, ছেলে দুটোর কথা শুনে আমার ভীষণ গর্ব হয়েছিল। আমি অন্যদেরও বলেছিলাম, শুনে ওরাও খুব বেশি। তবে হাত কাটা ক্যাপ্টেনের প্রশংসার কথাটা আর বলিনি তাহলে রবিন এমন ভাব আরম্ভ করবে যে ওর সাথে আর থাকাই যাবে না। তবে আসলে আমাদের মাঝে সবচেয়ে ভাল খেলে সলিল, রবিন নয়। আমাদের ড্রিল স্যার পর্যন্ত বলেছিলেন সলিল যদি আরেকটু বড় হতো তাহলেই ওকে স্কুলের টীমে নিয়ে নিতেন।

একদিন দোকান থেকে আম্মার জন্যে সুতার গুটি কিনে ফিরছি ঠাকুরপাড়ার একটা ছেলে আমাকে ধরল। খুব তাচ্ছিল্য করে বলল, তোদের নাকি কি একটা ফুটবল টিম আছে?

আমি রাগ চেপে বললাম, হুঁ। স্পুটনিক বয়েজ ক্লাব।

ছেলেটা ঠোঁট ওল্টালো, খেলবি নাকি আমাদের সাথে?

এমনি খেলতে পারি— আমি একটু চিন্তা করে বললাম, আসল খেলা পরে হবে।

ছেলেটা হাসি চেপে বলল, ঠিক আছে, এমনি খেলাই হোক !

তাহলে আসিস আমাদের মাঠে। আমি উদাসীন ভাবে বললাম, কাল বিকেলেই আসিস।

উঁহু। তোরাই আমাদের মাঠে আসিস। আমাদের মাঠ অনেক বড়!

না। আমি রাজি হলাম না। বললাম তোদের ছেলেরা বদের হাড়ি। আমরা জিতে গেলে মারপিট করবে।

আমাদের জিতে যাওয়াটা ওর কাছে এতই অস্বাভাবিক মনে হল যে ছেলেটা খিল খিল করে হাসতে লাগল। বলল, ঠিক আছে— আমরাই আসব। মনে থাকে যেন বিকেল পাঁচটায়।

আমি ফিরে এসে সবাইকে বললাম আগামী কাল বিকেলেই ঠাকুরপাড়ার টীমের সাথে খেলা। শুনে সবাই ভারি উত্তেজিত হয় পড়ল। আমি বললাম, এটা কিন্তু সত্যিকারের খেলা না —

তবে?

এমনি খেলা হবে। কাল দেখব ওরা কি করম খেলে। তারপর পরে আসল কম্পিটিশান হবে।

ওরা সবাই আমার বুদ্ধির প্রশংসা করল। আমরা ঠিক করলাম কাল প্রথমে আমরা খেলতে রাজি হব না। পরে নিমরাজি হয়ে খেলব আর এমন ভাব দেখাব যে খুব তাচ্ছিল্য করে খেলছি। একজন করে খেলা বন্ধ করে বসে থাকব, নিজেরাই নিজেদের একটা গোলও দিয়ে দেব। তাহলে হেরে গেলেও গায়ে খুব বেশি লাগবে না। ওরাও খুব বেশি ঠাট্টা করতে পারবে না।

পরদিন খেলার মাঠে ওরা হাজির হল। এমনি খেলা হচ্ছে বলার পরেও ওদের পাড়ার অনেক ছেলে খেলা দেখতে এসেছে। আমরা নিমরাজি ভাব দেখিয়ে উদাসীন ভাবে খেলতে লাগলাম। দেখি ঠাকুরপাড়ার টীমে আমাদের পাড়ার একটা ছেলে খেলতে নেমেছে। হীরা বলল, তুই ঠাকুরপাড়ার টীমে খেলছিস কেন? তুই না আমাদের পাড়ার?

ছেলেটা— নাম কাসেম তাচ্ছিল্য ভরে ঠোঁট উল্টে বলল, ইচ্ছে!

আমরা হৈ হৈ করে আপত্তি তুললাম, আমাদের পাড়ার ছেলে অন্য পাড়ার টীমে খেলতে পারবে না।

ওরা বলল, কাসেম, যদি আমাদের টীমে খেলতে রাজি হয় তাহলে ওদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওদের দলে ছেলে কম কাজেই এখন সে তাদের টীমেই খেলবে। কাসেম যে ঠাকুরপাড়ার টিম ছাড়া অন্য কোন টীমে খেলবে না সে তো জানা কথা। তার বাসাটাই শুধু এ পাড়ায়, চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া বন্ধুত্ব সব ঠাকুরপাড়ার ছেলেদের সাথে।

শেষ পর্যন্ত কাসেমকে ওদের সাথে খেলতে দিতে হল। খেলায় আমরা পরিস্কার ভাবে হেরে গেলাম। চারটে গোল খেয়েছি, একটি মাত্র দিয়েছি। বহু কষ্ট করে প্রাণপণ খেলেও এর বেশি একটা গোলও দেয়া গেল না। ওরা টিটকারি দিতে দিতে চলে গেলে আমরা খালি গায়ে মাঠে বসে ঘাস ছিড়তে লাগলাম।

টিমটা ভালই। রবিন অনেকক্ষণ পর একটা মন্তব্য করল।

কাসেম যদি আমাদের টীমে খেলত! হীরা দুঃখ করে বলল, কিন্তু যা বদমাইশ!

বিশ্বাসঘাতক! সলিল বিড়বিড় করে গালি দিল।

কাসেমকে আমাদের টীমে আনা যায় না? রবিনের প্রশ্ন শুনে আমরা একসাথে চেঁচিয়ে উঠলাম, পাগল হলি তুই?

ঠাকুরপাড়া হচ্ছে তার মক্কা মদীনা!

ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা হচ্ছে তার প্রাণের বন্ধু!

তবু চেষ্টা করব। রবিন গম্ভীর স্বরে বলল, তোরা দেখিস ওকে ঠিক আমাদের টীমে নিয়ে আসব, তারপর ঠাকুরপাড়ার সাথে ফাইনাল খেলা দেব।

কিভাবে আনবি?

দেখিস তো! রবিন কি যেন ভাবতে লাগল।

কাসেমকে আমাদের টীমে আনতে পারলে অবিশ্যি আমাদের টিমটা বেশ শক্ত হয়। কিন্তু তবু কি জেতা যাবে? ওদের হাবুল আর আব্বাস আমাদের স্কুলের ফুটবল টীমে খেলে, পায়ের গোছ এ-ই চওড়া!

সাহেব বাড়ির ভূত

কদিন ধরেই দেখছি রবিন কি যেন ভাবছে, আমাদের কিছু বলছে না। বুঝতে পারলাম কাসেমকে দলে টানার প্ল্যান করছে। অনেক করে বলার পরও রবিন আগে থেকে কিছু জানাতে রাজি হল না।

সেদিন রাত আটটার দিকে রবিন আমাদের বাসায় এসে হাজির। আমাকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করে আম্মার কাছে গিয়ে বলল ও একটু বাইরে যাবে আমাকে নিয়ে যেতে চায়। ঘণ্টাখানেকের মাঝেই ফিরে আসবে। আম্মা বহুদিন থেকে আমাদের চেনেন কাজেই কথা না বলে আমায় ডেকে দিলেন। রবিনকে নিয়ে বাইরে এসে দেখি হীরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, সলিলও আছে। সলিলের হাতে একটা কালো কাপড়ের বাণ্ডিল, হীরার কাছে একটা বড় বোতল, দুটি মাটির হাঁড়ি।

কি ব্যাপার? আমি অবাক হলাম। এসব দিয়ে কি করবি?

আয় না! কাসেমের বারোটা বাজাব।

রবিনের কাছে জানতে পারলাম কাসেম রাতে অংক স্যারের বাসায় অংক করতে যায়। যে পথ দিয়ে ফিরে আসে সেখানে সাহেব বাড়িটা পড়ে। পুরানো দালানের পাশে বেশ খানিকটা জঙ্গল, রাত বিরেতে ওখানে নাকি ভূত দেখা যায়। রবিন অনেক খবর নিয়েছে, রাত সাড়ে আটটার দিকে কাসেম নাকি এই পথ দিয়ে একা ফিরে যায়। রবিন ঠিক করেছে আজ সাহেব বাড়ির পাশে থেকে কাসেমকে ভয় দেখিয়ে দেবে — যেন

আর ঠাকুরপাড়ার টীমে না খেলে।

আমার ঠিক বিশ্বাস না হলেও পুরো ব্যাপারটা ভারি মজার মনে হচ্ছিল। সবাই মিলে গুটিগুটি হেঁটে সাহেব বাড়ির পাশে হাজির হলাম। অন্ধকার, জঙ্গল, গাছপালা দেখে আমার বেশ ভয় ভয় করতে লাগল। এরপর রবিন হীরাকে সাজাতে বসল। মাটির হাঁড়িটা হাতে নিয়ে হীরা হাত উঁচু করে দাঁড়াল আর কালো শাড়িটা দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওকে ঢেকে দেয়া হল। দেখতে হল নাংগা একটা পেত্নীর মত। তারপর রবিন একটা মুখোশ বের করল, ভয়ানক বিচ্ছিরি দেখতে — আমার গা ছমছম করে উঠে। তারপর সেটি ওর উঁচুকরা দু হাতে ধরে রাখা হাঁড়িটার সাথে বেঁধে দেয়া হল।

কাসেম যখন আসতে থাকবে তখন তুই কিচ্ছু করবি না। রবিন হীরাকে ওর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবি। যখন কাছে আসবে তখন আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে ওর খুব কাছে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এই জঙ্গলে ঢুকে পড়বি। ব্যাস একটা কথাও বলবি না, একবারও সোজাসুজি ওর দিকে তাকাবি না। বাকি সব আমরা করব।

সলিলকে পানি ভর্তি বোতলটা দিয়ে রবিন ওকে একটা গাছে তুলে দিল। গাছে উঠে বসলে বুঝিয়ে দিল, তোর কাছাকাছি আসতেই বোতলটা কাত করে পানি ঢালতে থাকবি। পারলে ওর শরীরের উপর! সলিল শুনে খিকখিক করে হেসে উঠল।

আমাদের ভাগ্য ভাল এর মাঝে কেউ এসে পড়েনি। দূরে কার গলার আওয়াজ পেয়ে আমি আর রবিন তাড়াতাড়ি জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়লাম। দুজন লোক হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। রবিন অনেকগুলো ঢিল জড়ো করে সাহেব বাড়িটার বারান্দায় উঁচু রেলিংয়ের পাশে বসে রইল। আমি একটু এগিয়ে লক্ষ্য করতে থাকলাম কাসেমকে দেখা যায় কিনা।

সলিল যখন পিঁপড়ের কামড় খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, হীরার দুহাত যখন টন টন করতে থাকল তখন শোনা গেল কাসেম আসছে। আমাদের হিসেবে ভুল করে দিয়ে সাথে ঠাকুরপাড়ার একটা ছেলে, গলা শুনে বুঝতে পারলাম আক্কাস, ঠাকুরপাড়ার ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন। একজনকে ভয় দেখানো যত সহজ দুজনকে দেখানো তত নয়। তবু আমরা হাল ছাড়লাম না। ওরা একটু কাছাকাছি আসতেই রবিন দুটো ঢিল ছুঁড়ল। ঢিল দুটো পড়ল ওদের পিছনে বেশ শব্দ করে।

ও কি? কাসেম ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

কি জানি! আক্কাসের গলার স্বরে ভয়। আমার হাসিতে পেট ফেটে যেতে চাইল। ঢিল দুটো পিছনে পড়েছে তাই ওরা পিছনে যেতে সাহস পাচ্ছে না। আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। অমনি রবিন বাকি মাটির হাঁড়িটার ভিতর মুখ ঢুকিয়ে নাক চেপে বিদঘুটে আওয়াজ করল, ঘ্রাঁ ঘোঁ ওঁ ওঁ ওঁ . . .

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু . . . কাসেম তোতলাতে থাকে।

আক্কাস ফিসফিস কর বলল, কাসেম তাড়াতাড়ি চল। জায়গাটা খারাপ।

অমনি রবিন নাক চেপে, মাটির হাঁড়ি মুখে নিয়ে উৎকট স্বরে সুর করে বলতে

থাকে,

ঘ্রাঁ ঘোঁ ঘ্রাঁ ঘোঁ নাক কাঁটা পেঁট ফুঁটো হাঁদা
ভিন পাড়াতে ঘুরিস কেন কাঁসেম হাঁরামজাঁদা
নাঁক খসবে চোখ ফুলবে কিকঁকিড় মিককিড় ধাঁ
রক্ত দিয়ে চুষে খাব ঘাড় কলঁজে পা - - -!

ইয়াল্লা— কাসেম আর্তনাদ করে ওঠে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্....

আমি এদিকে সেদিকে তিন চারটা ঢিল মারলাম। ওরা ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে দাঁড়াতেই দুটো ঢিল মারলাম পিছনে। ওরা আবার দৌড়াতে থাকে। সলিলের গাছের নিচে আসতেই ঝরঝর করে সলিল পানিটা ঢেলে দেয়।

আব্বাস চেঁচিয়ে ওঠে, কে যেন— কে যেন আমার গায়ে পেশাব করে দিয়েছে—

আমি বুঝতে পারলাম রবিন বোতলে সাধারণ পানি দেয়নি। কাসেমের গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেছে। শুনলাম ও বলছে দৌড় দে— দৌড় দে—

ঠিক এই সময়ে ওরা হীরাকে দেখতে পেল। লম্বা মিশমিশে কালো, দাঁত বের করা বীভৎস মূর্তি খুব আস্তে আস্তে হেঁটে রাস্তা পার হচ্ছে।

কে? কে? বলে কাসেম মিছেই ভাঙা গলায় চেঁচাল।

রবিন কাছাকাছি এসে আবার উৎকট স্বরে শুরু করল,

ঘ্রাঁ ঘোঁ ঘ্রাঁ ঘোঁ নাঁক কাঁটা পেঁট ফুঁটো হাঁদা।
ভিন পাড়াতে ঘুরিস কেন কাঁসেম হাঁরামজাঁদা - - -

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। কাসেম আঁ আঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে হীরাকে জাপটে ধরে গোঁ গোঁ করতে লাগল। আমার মনে হল ফিট হয়ে গেছে। হীরা ঘাবড়ে গিয়ে মুখোশ খুলে চেঁচিয়ে উঠল, ছাড়, ছাড় বলছি, আমি হীরা।

কে শোনে কার কথা! কাসেম তখন ভয়ের শেষসীমায় পৌঁছে সব রকম কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে। আমরা সবাই ছুটে এলাম সলিলও গাছ থেকে নেমে এল। আমরা যে ওকে ভয় দেখিয়েছি— ভূতটা যে হীরা, কাসেম সেসব কিছুই বুঝতে পারছিল না। কি রকম একটা শব্দ করে থর থর করে কাঁপছিল। আমার ভয় হতে লাগল, মরেই যাবে নাকি?

আব্বাস প্রথমে আমাদের খুব বিশ্রী করে গালি দিল। কাসেমের এ অবস্থা না হলে হয়ত মেরেই বসত। কাসেম খানিকক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হয়ে আমাদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে বোকার মত হাসতে লাগলাম। আব্বাস আরেকবার গালিগালাজ শুরু করতেই রবিন ধমকে উঠে বলল, থাম তো। তুইই বললি ভয় দেখাতে, আবার এখন নিজেই—

আমি? আব্বাসের চোখ কপালে উঠে গেল!

রবিন আমাকে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ খোঁচা দেয়, দ্যাখ দ্যাখ কি রকম অ্যাকটিং

করছে!

আক্কাস মুখ চোখ লাল করে বলল, মিছে কথা বলবি না।

রবিন ভীষণ সরলভাবে বলল বাঃ! আমরা কাসেমকে শুধু শুধু ভয় দেখাব কেন? তুইই তো সেদিন বললি, কাসেম নাকি ভীতু ওকে ভয় দেখিয়ে মজা পাওয়া যায়!

এক চড়ে দাঁত ভেঙে ফেলব। আক্কাস তোতলাতে থাকে।

দ্যাখ— রবিনও ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কাউকে বলতে নিষেধ করে তুই কবিতাটা পর্যন্ত লিখে দিলি। মাটির হাঁড়ি জোগাড় করে দিলি। আমাদের বললি আজ যেভাবে হোক কাসেমকে নিয়ে আসবি।

আক্কাস এইরকম আক্রমণে একেবারে হতবাক হয়ে পড়ে। আমরাও তখন শুরু করলাম,

আমি বললাম, কাজ নেই কাসেম ভয় পেতে পারে, তুই বললি ভীতু ছেলেকেই তো ভয় দেখাতে মজা!

কাসেম কখনো ভীতু নয়— হীরা বলল, সেবার মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সাথে মারামারি করেছে না?

তাই তো! সলিলও খুব অবাক হবার ভান করে, আক্কাস কেন যে ভীতু ভীতু করছিল বুঝতে পারছিলাম না।

আমরা সবাই কাসেমের কাছে মাফ চেয়ে নিলাম; আক্কাসের বুদ্ধি অনুযায়ী এটা যে করা উচিত হয়নি রবিন বারবার সেটা স্বীকার করল।

পরদিন প্রকাশ্যে স্কুলের মাঠে কাসেম আর আক্কাসের মারামারি হয়ে গেল। হেডস্যার দুজনকেই পিটিয়ে দিলেন। সেদিন বিকেলেই কাসেম আক্কাসের টীমে লাথি মেরে আমাদের টীমে চলে আসল। কৃতজ্ঞতা বশতঃ হীরা ওকে ভাইস ক্যাপ্টেনের পদটা ছেড়ে দিল।

খেলা

আমাদের স্পুটনিক বয়েজ ক্লাব তখন ভীষণ তুখোড় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে কাসেম চলে আসার পর। বেশ কিছুদিন চলে যাবার পর আমরা কাসেমকে ভূতের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ খুলে বলেছিলাম, কিন্তু ততদিনে সে আমাদের ডিটেকটিভ ক্লাবের মেম্বার, ব্ল্যাক মার্ডারের রক্ত শপথ করা সদস্য, স্পুটনিক বয়েজ ক্লাবের ভাইস ক্যাপ্টেন! কাজেই ওর আমাদের টিম ছেড়ে চলে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং ও সবকিছু শুনে ভারি মজা পেল। হাজার হলেও শুধু ওকে দলে টানার জন্যে আমরা এতটা করেছি। ও নিজে ভয় পেয়েছে বলে তার বিশেষ লজ্জা নেই, আক্কাসকে জব্দ করেছি বলেই খুশি!

এখন সলিল কাসেম আর রবিন সেন্টার ফরোয়ার্ড—এ খেলে। হীরা ব্যাকে খেলে। সাতজনে টিম — নান্টু আর মিশু রাইট আউট, লেফট আউট, আমি গোলকীপার। ঠাকুরপাড়াকে হারিয়ে দিতে পারলেই আমরা এ শহরের সেরা টিম হয়ে যেতে পারি। কাজেই আক্কাস যেদিন ঠাকুরপাড়ার হয়ে আমাদের সাথে খেলার একটা দিন তারিখ ঠিক করতে আসল, আমরা খেলতে রাজি হয়ে গেলাম। চেয়ার টেবিলে বসে রীতিমত কাগজে সই করে দুই ক্যাপ্টেন খেলার দিন তারিখ ঠিক করল। ঠিক হল আমাদের স্কুল টীমের ক্যাপ্টেন হবে সেদিনের রেফারী।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে সবাই দেখতে পেল সমস্ত পাড়া পোস্টারে ভরে গেছে। আমরা রাতে জেগে ওসব তৈরি করেছি। পোস্টারে খেলার তারিখ, স্থান, সময় ইত্যাদির পর সবাইকে খেলা দেখতে আসার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সব দেখেশুনে সলিল বলল, সবাইকে তো আসতে বলা হল, যদি হেরে যাই?

ইহ্! হারব কেন? রবিন একটু পরে বিড়বিড় করে বলল, আসলে নিজের পাড়ার ছেলেমেয়েরা না থাকলে আনন্দ পাওয়া যায় না।

যেদিন খেলা সেদিন বিকালে আমাদের পাড়ার সব ছেলেমেয়ে মাঠে এসে হাজির হল। তারা চেঁচামেচি করে মাঠ গরম করে রাখল। একটু পরে দেখি হীরু ভাই, শফিক ভাই— তারাও এসেছেন। আরেকটু পরে রবিনের আব্বাও গুটিগুটি হাঁটিতে হাঁটতে হাজির হলেন, তার সাথে সলিলের আব্বা তার পিছু পিছু আমার আব্বাও। এদিকে ঠাকুরপাড়ার টিম এসে হাজির হল। তাদের সাথে তাদের পাড়ার ছেলেরা। ওরা মাঠের উল্টো দিক দখল করে বসল। রেফারীও এসে গেছে, আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। উত্তেজনায় আমাদের বুক টিপটিপ করছে, বেশি ভয় নান্টুকে নিয়ে— ও মাত্র জ্বর থেকে উঠল। এক সময় রেফারী ইঙ্গিত করলে আমরা মাঠে ঢুকলাম, যেভাবে লীগের খেলোয়াড়রা নামে। সাথে সাথে তুমুল হাততালি, তাকিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার সবাই হাততালি দিচ্ছে এমন কি আব্বারাও। ভাল করে তাকিয়ে দেখি একপাশে বুলা আপা শিরি, আপা তারাও খেলা দেখতে এসে হাততালি দিচ্ছেন! আমাদের রীতিমত লজ্জা করতে লাগল। এত মানুষের ভিড় দেখে রাস্তার আশেপাশের লোকজনও এসে জমা হল। কিছু বখাটে ছোকড়াও একপাশে বসে বিড়ি খেতে লাগল।

আবার হাততালির শব্দ, এবারে ঠাকুরপাড়ার টিম মাঠে নামছে, তারপর দুই দলের ক্যাপ্টেন হ্যাণ্ডশেক করল। রেফারী টস করে আমাদের পূবদিকে পাঠিয়ে দিল। ভাগ্য খারাপ— ওদিক থেকে চোখে রোদ লাগে।

রেফারী বাঁশী বাজাতেই খেলা শুরু হল। সলিল কাসেম আর রবিন টুকটাক করে বল একেবারে ওদের গোল পোস্টের কাছে নিয়ে গেল। ওদের একজন ফেরত পাঠাল এদিকে, আমি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যতক্ষণ বল আমাদের পায়ের কাছে ততক্ষণ আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা গলা

ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে, যেই বল ঠাকুরপাড়ার ছেলেদের পায়ে চলে যায় অমনি মন্ত্রবলে সবাই থেমে যায়। তখন মাঠের অন্য পাশ থেকে উৎকট চিৎকার ভেসে আসে। মোটকথা তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ খেলা হচ্ছে। কোন দলই আরেক দলকে কাবু করতে পারছে না। পনের মিনিটের মাথায় হীরা প্রথম ফাউল করল, ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা ধরধর মারমার শব্দে চেঁচামেচি করতে লাগল।

আমি তখন তিন তিনটি মারাত্মক বল আটকিয়ে প্রচুর হাততালি পেয়েছি, গর্বে বুক দশ হাত ফুলে উঠেছে। সবাই আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে। মাঠের মাঝে তখন কাসেম একটা জটিল বলকে বের করে আনল, অমনি আমাদের পাড়া তুমুল চিৎকার করে উঠল। রবিন আর সলিল মিলে তখন বলটা কেটে সোজা গোল পোস্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ওদের দিকে ছুটে আসছে অন্যেরা, সলিল আক্কাসকে পাশ কাটিয়ে বলটা দিল রবিনকে রবিন এক মুহূর্তের সুযোগ পেয়ে লম্বা কিক করল। বলটা সাঁই করে গোল পোস্টে ঢুকে গেল— গোও-ও-ও . . . ল!!

সারা মাঠময় ছেলেমেয়েরা নেচে বেড়াতে লাগল। ঠাকুরপাড়ার ছেলেদের মুখ চুন। রেফারী সবাইকে মাঠ থেকে বের করে দিয়ে আবার খেলা শুরু করে দিল। ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে, বল শুধু আমাদের দিকেই চাপতে লাগল। আমার এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। হীরা মিশু আর কাসেম মিলেও আটকাতে পারছে না। বারবার ওরা গোল পোস্টে এসে পড়ছে। একবার ফাঁকা অবস্থাতে বল পেয়ে গেল। আমি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আক্কাস বল নিয়ে ছুটে আসছে, পিছনে কাসেম তার পিছনে রবিন। কিছু বোঝার আগেই কিক করল, আমার হাত পিছলে বল গোল পোস্টে ঢুকে পড়ল।

গোও-ও-ও . . . ল!! ঠাকুরপাড়ার ছেলেদের জয়ধ্বনি শুনতে পেলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল, গোলটা শোধ করে দিয়েছে। ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা তখন মাঠে নাচানাচি করছে, আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল এখনো অনেক সময় আছে।

রবিন এসে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, ভয় পাস নে। দেখিস ঠিক জিতে যাব।

ভয় আবার পেলাম কখন? তোরা ভাল করে খেল।

আবার খেলা শুরু হল।

কিছুক্ষণের ভিতর হাফ টাইম হল। বীরু ভাই লেবু আর চিউইং গাম দিলেন। ঠাকুরপাড়ার টিমের ছেলেরা কিছু আনেনি তাই ওরাও ভাগ পেল। মাঠে সবাই এসে আমাদের উৎসাহ দিল। শিরি আপা এসে বললেন, যদি জিতে যেতে পার মিষ্টি খাওয়াব।

ঠিক?

ঠিক।

রবিন কাটা হাতটা নাচিয়ে বলল, সবাই শুনে রাখ জিততে পারলেই মিষ্টি!

মিষ্টির লোভে না হলেও, আমাদের খেলাটা সবার সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ভেবে আমাদের রোখ চেপে গেল। জিততেই হবে।

আবার খেলা শুরু হল। এবার উত্তেজনা অনেক বেশি। বল একবার দারুণ ভাবে আমাদের দিকে ছুটে আসছিল আবার দারুণ ভাবে ওদের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। একবার আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা চেঁচাতে লাগল একবার তাদের ছেলেরা। রবিন আর সলিল মরিয়া হয়ে উঠল। খেলা শেষ হতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। একবার সুযোগ মত বল পেয়ে রবিন ছুটে চলল। আমার কেন জানি মনে হল এবারে গোল দিয়ে দেবে। আক্কাসকে পাশ কাটিয়ে ওদের ব্যাকের পাশ দিয়ে বল সরিয়ে রবিন সলিলকে পাশ দিল। সলিল আবার ফিরিয়ে দিল তাকে। রবিন বলটাকে থামিয়ে ঘুরে এক লম্বা কিক— গোলকীপারের হাত বাঁচিয়ে সোজা গোল পোস্টে, বুলেটের মত!

আমরা আনন্দে হাত ছুঁড়ে নাচতে লাগলাম। রবিন সবাইকে কানে কানে কি একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিল। খেলা শুরু হলেই বুঝতে পারলাম বুদ্ধিটা কি। লম্বা কিক দিয়ে ওরা বলটাকে মাঠে নাচাতে লাগল। দরকার হলে মাঠের বাইরে। সময়টা কোনমতে কাটাতে পারলেই কেল্লা ফতে! ঠাকুরপাড়ার ছেলেরা রাগে দুয়ো দুয়ো করতে লাগল। উত্তরে আমাদের ছেলেরাও উল্টো দুয়ো দিতে শুরু করল।

সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ ওরা একটা মারাত্মক সুযোগ পেয়ে গেল। রশীদ নামের ওদের সবচেয়ে মারাত্মক ছেলেটি ফাঁকা অবস্থায় কিভাবে জানি বলটা পেয়ে গেল। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে সে গোল পোস্টে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল। উত্তেজনায় আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। রবিন প্রাণপণে ছুটে আসছে পিছু পিছু সবাই। রশীদ তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে কিক করলেই গোল সুনিশ্চিত, নেহায়েত ভাগ্য যদি সাহায্য না করে। হঠাৎ রবিন পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর পুরানো কায়দায় কাটা হাত দিয়ে বলটা ছিটকে সরিয়ে দিল।

হৈ চৈ চেঁচামেচি তার মাঝে রেফারীর বাঁশী বেজে উঠল। পেনাল্টি হয়েছে। রবিন যুক্তি দেখাল ওর হাত নেই হ্যাণ্ডবল হতে পারবে না। রেফারী মানল না— ইচ্ছে করে হ্যাণ্ডবল, গোল পোস্টের সীমানার ভিতর, কাজেই এটি পরিষ্কার পেনাল্টি! রেফারীর বিরুদ্ধে তো কথা বলা যায় না রবিন আমার দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, তোর উপর সব নির্ভর করছে!

উত্তরে আমি ফ্যাকাসে ভাবে হাসলাম! আর মাত্র একটি মিনিট বাকি!

রশীদ পেনাল্টি কিক করবে, সবাই সরে দাঁড়াল। আমি একা গোল পোস্টে! উত্তেজনায় সবাই আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, রেফারী ঠেলে সরাতে পারছে না। ভিড়ের ভিতর থেকে বীরু ভাইয়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল, টোপন! গোল বাঁচাতে পারলে, মর্নিং শো!

আমার বুকের ভিতর তখন ঢাকের মত শব্দ হচ্ছে। এতো বড় গোল পোস্ট, তার মাঝে এতো ছোট আমি, তার উপর এতো কাছে থেকে কিক করছে! রেফারী বাঁশী বাজাল। রশীদ একটু হাসল, তারপর ছুটে এসে কিক করল— দারুণ জোরে!

উত্তেজনায় কিছু খেয়াল নেই শুধু দেখছিলাম বলটা গুলির মত ঠিক আমার দিকে ছুটে আসছে। ধাতস্থ হয়ে দেখি বলটা আঁকড়ে ধরে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছি; হৈ চৈ করতে করতে রবিন সলিল কাসেম ওরা এসে আমায় কাঁধে তুলে নিল। কে জানি চিৎকার করল থ্রী চীয়ার্স ফর টোপন— হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!!

এর মাঝে রেফারীর বাঁশী বেজে উঠল। খেলা শেষ, আমরা জিতে গেছি! আনন্দে আমার বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠে!

নদীর সাথে পরিচয়

শহরের সেরা ফুটবল টিম নাম হয়ে যাবার পর আমাদের আর ফুটবল খেলতে ভাল লাগে না। আগে আমাদের তবু একটা উদ্দেশ্য ছিল এখন কোন উদ্দেশ্য নেই। কি করব কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না ঠিক এই সময়ে আমরা একটা নৌকা পেয়ে গেলাম।

আমাদের সাথে ভর্তি হয়েছিল নতুন একটা ছেলে, নাম টিপু, ভারি সুন্দর দেখতে। ওদের বাসা নদীর তীরে। ছেলেটা আমাদের খুব বন্ধু হয়ে গেল। প্রথমে অবিশ্যি ওর ভাব হল নান্টুর সাথে। নান্টুর মত টিপুও ভীষণ গল্পের বই পড়ে। বই বদলাবদলি করতে করতে ওদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। পরে দেখা গেল নান্টুর সাথে তার অনেক মিল। সেও নান্টুর মত একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করতে চায়। নান্টু যেরকম কিছু জোগাড় করতে পারেনি ওর অবিশ্যি সেরকম অবস্থা নয়। বেশ অনেক যন্ত্রপাতি আছে, নিজে নাকি একটা সিনেমা প্রোজেক্টরও বানিয়েছে। ওর সাথে পরিচয় হবার আগে আমরা ভেবেছিলাম ও ভীষণ নাক উঁচু অহঙ্কারী। কিন্তু আমাদের বন্ধু হয়ে যাবার পর দেখলাম ওর স্বভাব ভীষণ ভাল। টিপু এতো ভাল ছেলে যে সবার সাথেই সে বন্ধু হয়ে যায়। ও কখনো রাগ করে না, খারাপ কথা বলে না। ওকে আমরা তুই তুই করে বললেও সে কিন্তু ভুলেও কখনো আমাদের তুই বলে না। ওকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু হাসে।

একদিন টিপু এসে আমাদের বলল, তোমরা আমাদের বাসায় এসো। আমি একটা নৌকা কিনেছি।

নৌকা? কিনেছিস?

আমি কিনিনি, আব্বা কিনে দিয়েছেন।

কিনে দিয়েছেন? তোকে? আমরা ভারি অবাক হলাম। নৌকা আবার কিনে দেবার

পাস নাকি? ফুটবল হলে না হয় একটা কথা ছিল, বড় জোর সাইকেল। তাই বলে নৌকা?

আব্বাকে বলেছিলাম। প্রথমে রাজি হননি পরে কিনে দিয়েছেন।

কত বড় নৌকা?

বেশি বড় না। দশ বারজন বসা যায়। আমি খুব ছোট চাইছিলাম, আব্বা বললেন একটু বড় হলে ডোবার ভয় কম থাকে।

ছই আছে? বৈঠা? পাল?

কিছুই নেই শুধু একটা বৈঠা আছে।

আমরা ভারি উৎসাহিত হলাম। স্কুল ছুটি হতেই বাসায় না গিয়ে সবাই টিপুর বাসায় হাজির হলাম। টিপু আমাদের নিয়ে ওদের বসার ঘরে বসাল। কি চমৎকার ঘর। নীল রংয়ের ভারি পর্দা ঘরটাকে আবছা অন্ধকার করে রেখেছে। লাল কার্পেট, ঝকঝকে সোফা, দেয়ালে বড় বড় ছবি, শেলফে হাজার হাজার বই, শোকেসে চিনামাটির পুতুল। আমরা বুঝতে পারলাম টিপুর আব্বা খুব বড়লোক।

একটু পর টিপু এল, সাথে তার আব্বা। আমরা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। হীরা তার বিচ্ছিরি ধ্যাবড়া পা দুটো সোফার তলায় লুকিয়ে ফেলল।

আব্বা, এরা আমার বন্ধু। নৌকা দেখতে এসেছে।

হুম! টিপুর আব্বা চশমার উপর দিয়ে তাকালেন। বললেন, এতগুলো বন্ধু জানলে তো আরেকটু বড় নৌকা কিনে দিতাম। তোমরা সবাই সাঁতার জানো তো?

আমরা ঘাড় নাড়লাম। টিপুর আব্বা রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি?

রবিন বলল, আমিও পারি।

টিপুর আব্বা বললেন, গুড। আমরা ভেবেছিলাম এবারে রবিনকে জিজ্ঞেস করবেন ওর হাতটা কিভাবে কেটেছে। কিন্তু দেখা গেল জিজ্ঞেস করলেন না। খানিকক্ষণ একথা সেকথা আলাপ করে বললেন, তোমরা বসে বিস্কুট খাও। আমি যাই। আবার দেখা হবে।

টিপুর আব্বা চলে গেলে হীরা বলল, তোর আব্বাটা তো খুব ভাল। যা চাস তাই দিয়ে দেন।

আসলে আমার একটা প্রাইজ পাওনা ছিল। কথা ছিল যা চাইব তাই কিনে দেবেন। এখানে নদী দেখে নৌকার কথা মনে হল। একবার কথা দিয়েছেন আর না করতে পারেন না। নৌকা কিনে দিতেই হল।

কিসের প্রাইজ?

টিপু একটু ইতস্তত করে বলল, বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম তো!

তুই ফার্স্ট হয়েছিলি?

টিপু মাথা নাড়ল। আমরা আড়চোখে মিশুকে দেখলাম। মিশু আমাদের ফার্স্ট বয়। এবারে ওর সাথে টিপুর যুদ্ধ হবে।

নৌকাটা ভারি চমৎকার। দশজন অনায়াসে বসতে পারে। দুটো দাঁড় লাগিয়ে নিলে তীরের মত উড়িয়ে নেয়া যাবে। একটা পাল বসাতে পারলে তো কথাই নেই। নৌকা করে নদীতে অল্প কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আমরা বাসায় ফিরে আসলাম। দেরি করে বাসায় ফেরার জন্যে আজ সবার ভাগ্যে অল্প বিস্তর পিটুনি জুটল। কিন্তু এখন আমরা একটা আস্ত নৌকার মালিক। ছোটখাট পিটুনির কথা অনায়াসে ভুলে যেতে পারি এবং ভুলে গেলামও।

আমরা এর পরে সময় পেলেই নৌকায় চড়ে বেড়াতাম। নদীর তীরে আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় কোথায় কি আছে আমাদের মুখস্থ হয়ে গেল। আমরা সবাই কম বেশি নৌকা চালাতে শিখে গেলাম। পিছনে হাল ধরে নৌকাকে সোজা সামনে নিয়ে যাওয়া দেখে খুব সহজ কাজ মনে হলেও আসলে মোটেই সোজা নয়। নৌকা চালাতে চালাতে আমাদের হাতের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠতে লাগল আর নদী সম্পর্কে ভীতি একেবারে কেটে গেল।

রবিনের কথা অবিশ্যি আলাদা। নৌকায় উঠে ও শুধু ছটফট করত। এক হাতে বৈঠা ধরে চালান যায় না কাজেই তার আর নৌকা চালানো শেখা হল না। ওর উৎসাহে নৌকায় দুটো দাঁড় লাগান হল। মাঝে মাঝে এক হাতে ও দাঁড় টানত কিন্তু অল্পক্ষণেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত। এত সহজে হার মানার ছেলে রবিন নয়। নিজের অক্ষমতাটা কিছুতেই ও মেনে নিত না। তাই কিছু করার না পেয়ে ও বাসা থেকে একটা পুরানো চাদর নিয়ে এসে বাঁশের সাথে লাগিয়ে একদিন ও একটা পাল তৈরি করে ফেলল।

নৌকা চালিয়ে নদীর মাঝামাঝি এসে আমরা যখন পুরোপুরি বাতাসের আওতায় পৌঁছে গেলাম তখন রবিন পাল তুলে দিল। সাথে সাথে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। বাতাস পেয়ে ভট্ করে পাল ফুলে উঠল, নৌকা সাঁই করে ঘুরে গেল আর নৌকার পাশে বসে থাকা মিশু, হীরা আর আমি ঝুপঝুপ করে পানিতে পড়ে গেলাম। সাঁতরে নৌকায় উঠে আমরা রবিনকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করতে লাগলাম। শার্ট প্যান্ট ভিজে জবজব করছে। আমাদের অবস্থা দেখে সবাই হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। রবিন যতই হাসতে লাগল আমাদের রাগ ততই বেড়ে উঠতে লাগল।

রবিন কিছুক্ষণের মাঝেই পালের কৌশল শিখে গেল। দেখা গেল পালে বাতাস লাগলে নৌকা উজান ঠেলেও তীরের মত ছুটে চলে। একজন শক্ত করে হালটা ধরে থাকলেই হয়। পাল টানিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বহুদূরে চলে এলাম। আগে কখনো এসব জায়গায় আমরা আসিনি ; এখানে নদীর মাঝে চর, বালুর মাঝে অদ্ভুত ধরনের লম্বা লম্বা ঘাস, বালি হাঁস, খানিক দূরে বেশ খানিকটা জঙ্গল ! একটা বহু পুরানো ভাঙা বাঁশের ঘর কাত হয়ে আছে। সব মিলিয়ে ভারি চমৎকার জায়গা। এত দূরে আসতে আমাদের কোন পরিশ্রমই হল না। পালের বাতাসেই কাজ চলে গেল।

যখন বিকেল ঘনিয়ে এসেছে তখন আমাদের ফেরার কথা মনে হল। আর হঠাৎ করে সবার প্রায় একই সাথে মনে হল যাওয়ার সময় বাতাস উল্টোদিকে পাব। পাল খাটিয়ে যাওয়া যাবে না। এতো দূরে চলে এসেছি যে আমাদের বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। সবার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। আজও ভাগ্যে পিটুনি আছে।

আমরা নৌকা ঘুরিয়ে বাসার দিকে ছুটলাম। ভাগ্য ভাল ভাটার টানে স্রোতটা তখন আমাদের পক্ষে। রবিন হেইয়া হো, হেইয়া হো বলে একটা দ্রুত তাল তৈরি করে ফেলল ঝপাঝপ সেই তালে দাঁড় পড়তে লাগল। আস্তে আস্তে তাল আরো দ্রুত হয়ে উঠতে থাকে। আর তার সাথে সাথে ঝপাং ঝপাং করে দাঁড় পড়তে থাকে। বৈঠা হাতে একজন শক্ত করে হাল ধরে রাখে। দুজন ক্লান্ত হতেই নতুন দুজন দাঁড় নিয়ে বসল। ঝপাঝপ ঝপাঝপ্। শব্দ তুলে নৌকা ছুটে যেতে লাগল।

আমরা চেঁচামেচি হৈ চৈ করে একটা অদৃশ্য নৌকার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলাম, প্রতিমুহূর্তে আমরা সেটাকে প্রায় ধরে ফেলছিলাম। সন্ধ্যার অল্প আলোয় দু তীরের চাষী, গ্রাম্য বউ, ছেলেমেয়েরা হাসি মুখে আমাদের এই পাগলামি লক্ষ্য করছিল। তারা তো জানত না বাসার পিটুনি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এই তাড়াহুড়ো।

তবুও রাত আটটার আগে আমরা পৌঁছতে পারলাম না। বুক টিপটিপ করতে করতে যখন আমরা বাসায় ফিরে আসছিলাম তখন এশার নামাজের আযান হচ্ছে। রবিন একটু চিন্তিত মুখে বলল, নৌকায় আরও দুটো দাঁড় বসাতে হবে।

হীরা মুখ খিঁচিয়ে বলল, আগে দ্যাখ বাসায় গেলে হাড় একটা আস্ত থাকে কি না।

নাই বা থাকল— রবিন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল।

ধূমকেতু

প্রথমে নান্টু বলল, ভোররাতে আকাশে ধূমকেতু দেখা যায়। পরে টিপু বলল সে নাকি দেখেছেও। ধূমকেতুর নামও বলল— ইকেয়াসেকী। পরে সবাই বলল তারা সবাই নাকি দেখেছে। মাথাটা নাকি ছোট্ট আর লেজ বিরাট লম্বা। আমরাও দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কিন্তু ভোররাতে ঘুম থেকে ওঠা কি সোজা কথা? আম্মাকে খুব করে ডেকে তুলতে বলে রাখলাম। আম্মাও একদিন ডাকতে শুরু করলেন— কিন্তু লেপের তলা থেকে বের হতে এত বিরক্তি লাগল কি বলব। আম্মা বললেন, এই টোপন, ওঠ। ধূমকেতু দেখবি না?

উঁ। বিরক্ত করো না।

সারাদিন বলে রাখলি এখন বিরক্ত? ওঠ—

না, না—

ওঠ বলছি।

উঠছি।

ওঠ।

এই, এই উঠলাম—

কি ? উঠলি ?

এই তো।

আহ্ ! উঠবি না ?

উঁ আর একটু—

কাজেই আমার আর ওঠা হয় না ধুমকেতুও দেখা হয় না। শুধু আমার না সবার। এভাবে অনেকদিন পার হয়ে গেল। টিপু এসে একদিন বলল, ধুমকেতু আর বেশিদিন দেখা যাবে না। তখন আমাদের সবার টনক নড়ল।

রবিন এসে একদিন বলল আজ রাতে সে যেভাবে হোক ঘুম থেকে উঠবে তারপর সবাইকে ডেকে তুলবে। সত্যি সত্যি শেষ রাতে শুনি রবিন ডাকছে।

এই টোপন ওঠ। না হয় দিলাম পানি ঢেলে।

উঁ। আমি নড়েচড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ওঠ ! ওঠ বলছি। না হয় দিলাম পানি ঢেলে।

বিরক্ত করিস না।

তিন পর্যন্ত গুনবো। তারপর পানি ঢালবো। এক।

আমি শুয়েই থাকলাম।

দুই। আমি পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করলাম সত্যি হাতে পানিটানি কিছু আছে কিনা।

তিন— বলেই কিছু বোঝার আগে রবিন আমার গায়ে পানি ঢেলে দিল। আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম— রবিন খালি গ্লাসটা হাতে নিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল। আমার এমন রাগ লাগছিল যে বলার নয় কিন্তু ঘুমটা ভেঙেছে ঠিকই। আম্মা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক হয়েছে। এভাবেই তোর ঘুম ভাঙাতে হয়।

রবিন বলল, আম্মাও আমাকে এভাবে ঘুম থেকে তুলেছেন। এই দেখেন না, শার্ট ভেজা— রবিন তার ভেজা শার্টের কলার দেখাল।

ভেজা শার্ট ! বদলে যাও— আম্মা আতঙ্কিত স্বরে বললেন— অসুখ করবে তো।

কিছু হবে না। বলে রবিন আমাকে নিয়ে চলল সলিলদের বাসায়। দুটো ডাক দিতেই সলিল চটপট উঠে গেল। তারপর আমরা গেলাম নান্টুর বাসায়। নান্টুর কানে পালক দিয় সুড়সুড়ি দিয়ে রবিন ওকে ডেকে তুলল। ঘুম থেকে উঠে নান্টু রাগে গজ গজ করতে লাগল। আমাদের দল ভারি হয়ে উঠলে হৈ চৈ চেঁচামেচিতে সবাই উঠে পড়ল। আমাদের ছোট ভাইবোন, আব্বা, আম্মা, শিরি আপা, বুলা আপা, শফিক

ভাই, বীরু ভাই, বীরু ভাইদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর, সলিলদের মোরগ— সবাই জেগে উঠে ভীষণ হৈ চৈ করতে লাগল। মনে হতে লাগল বুঝি আজ ঈদ। সবাই খোলা মাঠে এসে ধূমকেতু দেখতে লাগলাম। নান্টুর টেলিস্কোপটা সবার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল আর নান্টু গর্বে এমন ভাব করতে লাগল যেন টেলিস্কোপ নয়, সে একটা আস্ত রকেট বানিয়েছে।

ধূমকেতুটা দেখতে যা ভীষণ— সেটা বুঝিয়ে বলা যায় না। ছোট্ট জ্বলজ্বলে একটা মাথা আর প্রকাণ্ড বড় লেজ আকাশটা প্রায় অর্ধেক দখল করে রেখেছে। তবে খুব ঝাপসা, নান্টুর টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে আরো ঝাপসা দেখা যায়। কিছুক্ষণের ভিতর সবার ধূমকেতু দেখা শেষ হয়ে গেল। সবাই ঘুমোতে চলল। কিন্তু চেঁচামেচি হৈ চৈ করে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে এখন হাজার চেষ্টা করলেও ঘুম আসবে না। আমরা ঠিক করলাম এখন আর ঘুমাবো না, লুকোচুরি খেলব।

আম্মারা বৃথাই খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করে গিয়ে শুয়ে পড়লেন— আমরা খুব উৎসাহের সাথে লুকোচুরি খেলতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পরেই ভয় ভয় লাগতে লাগল। অন্ধকারে কে কোথায় লুকিয়েছে বোঝা যায় না আর বুকের ভিতর ধুক ধুক করতে থাকে, মনে হয় অন্ধকার থেকে কেউ বুঝি লাফিয়ে ঘাড়ে এসে বসবে!

এর মাঝে হঠাৎ রবিন বলল, চল আমাদের গুপ্তধনটা দেখে আসি।

এতো রাতে?

হ্যাঁ। ক্ষতি কি?

শ্মশানের কাছে! জঙ্গলে! না বাবা আমি যাব না! নান্টু বেঁকে বসল।

যাবি না কেন? আমরা এতগুলো মানুষ।

ব্যাপারটাতে বেশ খানিকটা ভয় আছে। সবাই মিলে যাব তাই ভয়টা গায়ে লাগবে না, অথচ ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর হবে। আমরা রাজি হয়ে গেলাম, নান্টুও বাধ্য হয়ে রাজি হল।

সেই শেষরাতে, অন্ধকারে, নির্জন পথে আমরা দল বেঁধে হাঁটতে লাগলাম। অন্ধকার ছমছমে ভাব, নির্জন রাস্তা, মাঝে মাঝে টিমটিমে লাইট পোস্টের আলো, সব মিলিয়ে এমন হয়ে গেল যে আমরা ধীরে ধীরে চুপচাপ হয়ে গেলাম। কথাবার্তা হতে লাগল ফিসফিস করে, মনে হতে লাগল জোরে কথা বললেই একটা কিছু ঘটে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় একটা গাছের নিচে আসতেই একটা পাখি এমন ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল যে আমরা সবাই ভীষণ চমকে উঠলাম।

নদীর তীরে এসে আমাদের গা ছমছম করতে লাগল। এখন শ্মশান পার হয়ে জঙ্গলে ঢোকা সত্যি খুব সাহসের কাজ। সবগুলি ভূতের গল্প আমার একসাথে মনে পড়ে গেল।

ঐ দেখ! ফিসফিস করে বলে সলিল হঠাৎ ছিটকে আমাদের কাছে সরে আসল।

কি? আমরা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কি?

সলিল নদীর তীরে খানিকটা দূরে আঙুল দিয়ে দেখাল। আবছা অন্ধকার তার মাঝে খানিকটা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি জমাট অন্ধকারগুলি অল্প অল্প নড়ছে। ঈষৎ আলো হঠাৎ জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল।

কি ওখানে? নান্টুর গলার স্বরে বুঝতে পারলাম ও ভয় পেয়েছে।

কয়েকজন মানুষ নৌকা থেকে নামছে। রবিন আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল। আমরা আরো ভাল করে তাকালাম। নদীর তীর যখন নৌকা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ঐ বড় জমাট অন্ধকারটা কিসের?

চল যাই। রবিনের কথায় আমরা চমকে উঠলাম।

কোথায়?

ওখানে, দেখে আসি।

পাগল। কেন না কে— আমাদের খুন করে রেখে যাবে।

ইহ্! আমরা এতোজন ছেলে।

ওরা যদি আমাদের থেকে বেশি হয়?

আমরা লুকিয়ে থাকব দেখতে পাবে না তো। রবিন ফিসফিস করে বলল, উঁচু সড়কটার পাশে উবু হয়ে বসে থাকব।

না, না। নান্টুর মোটেই উৎসাহ নেই।

আরে চল না— রবিনের উৎসাহ দেখে আমাদের রাজি হতে হল। ওর মাথাটা সাফ, আমাদের ভিতর যাদের শার্ট সাদা সেগুলি খুলে হাতে নিতে বলল, অন্ধকারে সেগুলি অনেকদূর থেকে দেখা যায়। আমরা সাদা শার্টগুলি খুলে গুটি পাকিয়ে হাতে নিয়ে নিলাম। তারপর গুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

আমরা যেদিক দিয়ে যাচ্ছি সেটা রাস্তা নয়, রাস্তার পাশে শুকনো নালাটা। খানাখন্দ, ইঁট পাথর জঙ্গল, গোবর সব মাড়িয়ে আমরা যতটুকু সম্ভব কাছে গেলাম— উত্তেজনায় আমাদের বুক টিপ টিপ করছে। যেটাকে জমাট বাঁধা বড়োসড়ো খানিকটা অন্ধকার দেখা যাচ্ছিল সেটা আসলে একটা রিক্সা। নদীর তীরে বালুর উপর দিয়ে ছেছড়ে এতদূরে রিক্সা কেন এনেছে বুঝতে পারলাম না। রিক্সাটা নদী থেকে অল্প দূরে। নদীতে একটা নৌকা। টিপুর নৌকাটার মতোই তবে আরো সরু আর অল্প কিছু লম্বা। আমরা কয়েকজন লোকের চাপা গলার স্বর শুনতে পেলাম, কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারলাম না!

হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল— মনে হল কাউকে যেন কেউ ছোরা মেরেছে। আমরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। উঠে দৌড় দেব কিনা বুঝতে পারছিলাম না ঠিক সেই সময় গোঙানোর আওয়াজ শোনা গেল, কে যেন গোঙাতে গোঙাতে বিশ্রী ভাষায় গালি দিচ্ছে।

একটু পরেই দেখা গেল নৌকা থেকে একজন লোককে কয়েকজন ধরাধরি করে নামাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে লোকটি অসুস্থ, এতক্ষণ ধরে সেই গোঙাচ্ছিল, সেই গালিগালাজ করছিল।

হারামজাদা, ঠিক করে ধরতে পারিস না? লোকটা আবার কাকে গালি দিল। অসুস্থ অবস্থাতেই এর এতো দাপট? আমরা ভারি অবাক হলাম। কে একজন বেকায়দা ধরতেই লোকটা আবার চাপা আর্তনাদ করে উঠল— শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা মেরে ফেলল! আঃ! আহ্—

বুঝতে পারলাম কোথাও ওর মারাত্মক জখম আছে। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কোথায়। ওকে টেনে রিক্সায় তোলা হল। রিক্সায় উঠে গলা নামিয়ে বলল— কিন্তু আমরা ঠিকই শুনতে পেলাম, কেউ দেখেনি তো?

না।

অন্ধকারে আমাদের হাত পা সিঁটিয়ে গেল।

একটা বিড়ি দে তো। আবার লোকটার গলার আওয়াজ শোনা গেল। তাকে একটা বিড়ি দেয়া হল। ম্যাচ জ্বালতেই দেখলাম নিষ্ঠুর উৎকট একটা মুখ, লম্বা লম্বা চুল মিশমিশে কাল, বাম হাতে কাপড় জড়ানো ভাঁজ করে বুকের কাছে রাখা, কাপড়ে রক্তের কালচে ছোপ। একটা পাও মনে হল কাপড়ে জড়ানো। দেখে আমাদের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠল।

এই ইয়াসিন, চল। একটা লোক যার নাম ইয়াসিন, রিক্সাকে টেনে নিতে থাকে অন্যেরা পিছনে ঠেলতে থাকে আর ঐ বীভৎস দর্শন ভয়াবহ লোকটা রিক্সার ঝাঁকুনির সাথে সাথে আঃ উঃ করতে থাকে।

আমরা আবার পা টিপে টিপে শ্মশানের কাছে ফিরে এলাম তারপর একটি কথাও না বলে ভয়ে ভয়ে বাসায়। পথে প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল সেই দলটার সাথে দেখা হয়ে যাবে আর ওরা হা হা করে আমাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

লোকটা হচ্ছে একটা ডাকাত সর্দার। কথাটা রবিন প্রথম বললেও আমরাও সবাই মনে মনে এটি ভাবছিলাম। ভীষণ দর্শন সব লোকদেরই আমাদের ডাকাত বলে ভাবতে ইচ্ছে করে আর এর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কি ভয়ানক সন্দেহজনক কথাবার্তা, কাজকর্ম, কি ভয়াবহ চেহারা, বাঁ হাতে জখম, রক্তের ছোপ এ যদি ডাকাত না হয় ডাকাত কে হবে?

ওকে আমরা ধরিয়ে দেব।

কেমন করে? সলিল জিজ্ঞেস করে, চলেই তো গেল রিক্সা করে।

খুঁজে বের করব। কোথায় গেছে তো বোঝাই যাচ্ছে।

কোথায় গেছে?

ডাক্তারের কাছে। রবিন বিজ্ঞের মত বলল, দেখিসনি হাতে গুলি লেগেছে? এবারে

হাত কেটে ফেলতে হবে। রবিন একটু হাসল, তারপর নিজের কাটা হাতটি নাড়ল।

গুলি? হীরা সন্দেহ প্রকাশ করল। গুলি তুই কেমন করে বুঝলি? হয়তো ফোঁড়া উঠেছে—

আরে ধ্যেৎ গাধা! ফোঁড়া উঠলে এরকম হয়? রবিন খিকখিক করে হাসল। এটা গুলি ছাড়া আর কিছু নয় কোথায় ডাকাতি করতে গিয়েছিল আর বেকায়দায় পড়ে গুলি খেয়েছে।

পেপারে পাওয়া যাবে তাহলে— আমি একটু ভেবে বললাম, কাল পরশুর পেপারে দেখতে হবে আশে-পাশে কোথাও ডাকাতি করতে গিয়ে কোন ডাকাত দল গুলি খেয়েছে কি না।

ঠিক বলেছিস! রবিন আমার ঘাড়ে থাবা দিল। বলল একটা প্ল্যান করে কাজ করতে হবে। তারপর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, নৌকাটার উপর নজর রাখতে হবে, আবার কোথায় না কোথায় চলে যায়। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল, আর সবাই শোন, কাউকে কিছু বলবি না কিন্তু খবরদার।

আমাদের ডিটেকটিভ ক্লাব প্রথম বারের মত একটা সত্যিকারের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

খোঁজখবর

ভোরেই বুঝতে পারলাম দিনটা ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ হবে। গতরাতের সদ্য সদ্য ঘটা সেই ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। পড়াতে কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না, কল্পনায় দেখছিলাম আমরা এই দুর্ধর্ষ ডাকাত দলটিকে ধরে ফেলেছি। পেপারে পেপারে আমাদের ছবি ছাপা হয়েছে। সবাই ভীষণ অবাক হয়ে বলছে, এতদিন গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু এরা তো সাংঘাতিক!

আম্মা আমাকে বইয়ের সামনে এরকম উদাস ভাবে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে? সকালবেলা থেকে বসে বসে কি ভাবছিস?

আমি লজ্জা পেয়ে বইয়ের দিকে তাকালাম। তারপর গুনগুন করে পড়তে লাগলাম, দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রণে পানি তৈরি হয়।

স্কুলে যাওয়ার সময় রবিনকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কথা। আমি রবিনদের বাসার সামনে গিয়ে রবিনকে ডাক দিলাম! সাথে সাথে রবিন বেরিয়ে এল পিছু পিছু চিরুনি হাতে তার আম্মা। বলছিলেন, চুল আঁচড়ে যা বাঁদর।

রবিন বিরক্ত হয়ে মাথা পেতে দিয়ে গজগজ করতে লাগল। তার আম্মা চুল আঁচড়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন। বললেন, এসো টোপন তোমারটাও

আঁচড়ে দিই।

আমি লাল হয়ে বললাম, না খালাম্মা, লাগবে না।

আহা এসোই না! মাথাটা তো কাকের বাসা হয়ে আছে!

রবিনের আম্মা চুল আঁচড়াবার সময় আমার চিবুক ধরে নিলেন। আমার ভীষণ লজ্জা করতে লাগল আর ভয় হচ্ছিল হয়তো কেউ এ অবস্থায় দেখে ফেলবে। চুল আঁচড়ানো শেষ হলে আমরা স্কুলে রওনা দিলাম। একটু দূরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, দ্যাখ তো রবিন, সিঁথিটা মাঝে হয়ে যায়নি তো? আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল।

রবিন আমার মাথার দিকে তাকিয়ে হা হা করে হাসতে লাগল। তোকে মেয়েদের মত দেখাচ্ছে রে! মাঝে সিঁথিতে তোকে রীনার মত দেখাচ্ছে!

আমি তাড়াতাড়ি মাথার চুল এলোমেলো করে ফেললাম মাথার মাঝখানে সিঁথি করে স্কুলে গেলে উপায় আছে? আমার নামই হয়তো দিয়ে দেবে করিম নেসা!

রবিন তখন আরো জোরে হাসতে লাগল। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে বলল, তুই একটা গাধা। মাঝখানে সিঁথি হবে কেন? ঠিকই ছিল! আম্মা কি তোর সাথে ইয়ার্কি করবে নাকি?

আমি লজ্জা পেলাম, রাগ হলাম আরও বেশি। কিন্তু উপায় কি? রবিনটা বরাবরই এ রকম বিচ্ছু।

একটা ডাক্তারখানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে আমার গত রাতের কথা মনে হয়ে গেল। আমি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে রবিনকে জিজ্ঞেস করলাম, রবিন, ডাকাত সর্দারকে কিভাবে ধরব কিছু ঠিক করেছিস?

রবিন অকারণেই চারিদিক তাকিয়ে গলা আরও নামিয়ে বলল, এখনও ঠিক করিনি। তোর বুদ্ধিটা ভালই। আগে পত্রিকায় দেখব আশে-পাশে কোথাও ডাকাতি হয়েছে কিনা। তারপর সব ডাক্তারের কাছে খোঁজ নিতে হবে কোন হাতে গুলি খাওয়া রোগী গেছে কিনা।

খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। আমি এদিক সেদিক তাকিয়ে বললাম, কেউ যেন টের না পায়। উত্তেজনায় আমার বুকের ভিতর কাঁপতে শুরু করল। সত্যি, কি একটা দারুণ কাজ আমরা করতে যাচ্ছি।

স্কুলে গিয়ে দেখি সলিল, নান্টু আর মিশু টিপুকে নিয়ে মাঠের এক কোণায় বসে গুজগুজ করছে। আমাদের দেখে ছুটে এল। ক্লাসে বই রেখে এসে আমরা তক্ষুনি মাঠের এক কোণায় গোল হয় বসে পড়লাম। অনেক তর্কবিতর্ক, আলোচনা করে ঠিক করা হল টিপুর বাসা থেকে টিপু নান্টুর টেলিস্কোপ দিয়ে সবসময় নদীর উপর নজর রাখবে। টিপু আমাদের সাথে ছিল না, সে নৌকা বা ডাকাত কাউকেই দেখেনি। কাজেই নান্টুর উপর ভার থাকল টিপুকে সে নৌকাটা চিনিয়ে দেয়ার। নান্টু গজগজ

করতে লাগল. রাত্রি বেলা, অন্ধকার, কিছু দেখিনি, কাউকে চিনি না, কিভাবে বের করব ?

তাহলে যা বুড়ী-চি খেলগে মেয়েদের সাথে। রবিন খেঁকিয়ে উঠল, শার্ট খুলে ফ্রক পর একটা !

নান্টু খুব অনিচ্ছার সাথে রাজি হল। বলতে লাগল, চিনতে না পারলে কিন্তু আমার দোষ নেই।

আমরা ওর কথা না শোনার ভান করলাম। সলিল আর মিশুর উপর ভার থাকল গত সপ্তাহের কাগজ দেখে কোথায় কোথায় ডাকাতি হয়েছে তার একটা লিস্টি তৈরি করার। মিশু এই কেরানীর কাজে আপত্তি জানাতেই আমরা হৈ হৈ করে উঠলাম, তুই ছাড়া এসব কে করবে? ইংরেজি পত্রিকা তো আমরা পড়তেই পারি না। আর সব আসল খবর থাকে ইংরেজি পত্রিকাতে। বাংলা পত্রিকায় থাকে শুধু সিনেমার খবর।

সত্যি সত্যি মিশু ইংরেজিতে দারুণ ভাল। পরীক্ষায় সত্তর আশি করে নম্বার পায়। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেও 'চুলকানি' কিংবা 'বমি বমি ভাব' এসব শব্দের ইংরেজি বলে দিতে পারে। ছেলেবেলায় নাকি ও ইংরেজি স্কুলে পড়ত।

আমি, রবিন হীরা আর কাসেম সব ডাক্তারখানাতে খোঁজ নিতে যাব ঠিক করলাম। দেখা গেল মনে মনে সবারই আমাদের সাথে যাবার ইচ্ছে। আমরা নানারকম ভয়ভীতি দেখিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করলাম। বেশি মানুষ দেখলে সন্দেহ করবে এরকম কথাবার্তা বললাম।

আরো কয়েকটা ব্যাপার ঠিক করে নেয়ার কথা ছিল কিন্তু ঠিক এই সময় ঘন্টা পড়ে গেল। আমরা উঠে ক্লাসের দিকে রওনা দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি এমন সময় রবিন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ঐ যা ! সর্বনাশ হয়েছে !

কি ?

ইংরেজি গ্রামার খাতাটা আনিনি !

আমরা অনুকম্পার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। আজ ওর ভাগ্যে শক্ত পিটুনি আছে। আজীজ স্যার যে কড়া ! হীরা দাঁত বের করে বলল, খাবি কষে মার। হিঃ হিঃ হিঃ।

স্কুল ছয় পিরিয়ড হয়ে ছুটি হয়ে গেল, স্যারদের নাকি কি একটা মিটিং আছে। আমার কাছে লক্ষণটা বড় ভাল মনে হল। এমনিতেই আমাদের কাজ শুরু করার জন্যে বেশ সময় দরকার ছিল। তার উপর শেষ ক্লাসটা ছিল ইতিহাস স্যারের, ক্লাসটা করা লাগল না। ইতিহাস স্যারটা পড়া না পারলে এমন মার মারতে পারে ! (ছেলেরা বলে স্যারের বুকে নাকি লোম নাই, বুকে লোম না থাকলে লোকেরা নাকি নিষ্ঠুর হয়।)

সকাল সকাল ছুটি পেয়ে আমরা সবাই যে যার কাজে চলে গেলাম। নান্টু তার বাসায় বই রেখে টেলিস্কোপটা নিয়ে টিপুর সাথে গেল। ওরা গুজগুজ করে সারাক্ষণ

একটা রকেট বানানোর কথা বলছিল। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল ডাকাত ধরায় ওদের উৎসাহ নেই, রকেট বানানোই যেন বেশি দরকার।

সলিল আর মিশু বারান্দায় বসে বসে খবরের কাগজ খুঁটে খুঁটে পড়তে লাগল। আমি হীরা আর রবিন কিভাবে কাজ শুরু করব ঠিক করার জন্যে এক জায়গায় বসলাম। কাসেম শুধু থাকতে পারল না, আজ নাকি ওর ওদের খালার বাসায় যাওয়ার কথা।

অনেক তর্কবিতর্ক করে আমরা প্রথমে গেলাম হাসপাতালে।

রবিনের আব্বা হাসপাতালের ডাক্তার, রবিন ওখানকার সবাইকেই চেনে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল হাতে জখম এমন কোন রোগী এখানে আসেনি।

এরপর আমরা একজন একজন কর সব কয়জন ডাক্তারের কাছে গেলাম, নানা ভাবে জানতে চেষ্টা করলাম তারা কোন হাতে জখম এমন রোগীর চিকিৎসা করেছে কি না! আমাদেরকে কেউ এতটুকু পাত্তা দিল না। কম্পাউণ্ডার আর কর্মচারীরা আমাদের কথার উত্তর দেয়া দূরে থাক, মাঝে মাঝেই ধমকে দিল। তার মাঝেও আমরা চেষ্টা করলাম আসল খবরটি বের করে নিতে। খবর পাওয়া গেল খুব কম আর যেটুকু পাওয়া গেল সেটুকুও খুব হতাশাব্যঞ্জক।

ডাকাত সর্দারটি যে কিভাবে বাতাসে উবে গেল আমরা বুঝতেই পারলাম না। লাভের মাঝে লাভ হল হীরা একটা ওষুধের দোকানের কর্মচারীর সাথে ঝগড়া করে এলো আসল রাতে ঢিল মেরে সব ওষুধের শিশি গুঁড়ো করে দেবে।

আমরা ফিরে এসে দেখি অন্য সবাই মিলে কিংকুইন খেলছে। দেখেই আমাদের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমরা এত কষ্ট করে ঘুরোঘুরি করে খবরাখবর জোগাড় করার চেষ্টা করছি আর তারা মজা করে খেলছে? হীরা মুখ চোখ লাল করে ওদের গালি দিল, তোদের কাজ করেছিস কিছু? খুব যে খেলা শুরু করেছিস?

ওরা খেলায় এত ব্যস্ত ছিল যে আমাদের লক্ষ্যই করল না। সলিল তো ভুল করে হীরার পিঠে টেনিস বলটা দড়াম করে মেরেই বসল—তারপর বিচ্ছিরি মারামারি।

সবাইকে ঠাণ্ডা করে বসিয়ে দিয়ে আমরা কাজ শুরু করলাম।

ডাকাতটা ধরতে পারলি? মিশু জিজ্ঞেস করল।

ডাকাত তো রসগোল্লাটা! আমি উল্টো ধমক দিলাম, তোমার জন্যে রাস্তার মোড়ে বসে আছে কি না!

মিশু লজ্জা পেল। বিড়বিড় করে কি জানি বলে থেমে গেল। আমরা আমাদের পুরো তিক্ত অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করলাম। শুনে সবাই দমে গেল।

যাই হোক, রবিন মিশুকে জিজ্ঞেস করল, তোর কাজ কতদূর?

কমপ্লিট। বলে সে পকেট থেকে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করে দিল।

সেখানে মোট আঠারোটা ডাকাতির খবর। চট্টগ্রামের খুমচাছিয়া গ্রামের হোসেন মিয়ার বাড়ি থেকে শুরু করে দিনাজপুরের মেখিকান্দা গ্রামের হরেন পালের দোকান লুটের খবর পর্যন্ত আছে। সবচেয়ে পুরানোটি একমাস এগারো দিন আগেকার আর সবচেয়ে নতুনটি গত সপ্তাহের। সবমিলিয়ে মানুষ মারা গেছে ছয়জন, আহত হয়েছে পনেরোজন, ডাকাত ধরা পড়েছে সাতজন। ডাকাতি হয়েছে আনুমানিক তিন লক্ষ দুই হাজার সাত শত বাইশ টাকা! মিশু ছক কেটে পরিষ্কার হাতের লেখায় সবকিছু সুন্দর করে লিখে এনেছে, দেখে একনজরেই সবকিছু বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের যে খবরটি দরকার, আশে-পাশে কোথাও আজকালের ভিতর ডাকাতি হয়েছে কিনা এবং ডাকাতি করতে গিয়ে ডাকাত গুলি-টুলি খেয়েছে কিনা, সে খবরটি কোথাও নেই। মিশু বলল সেরকম কোন ঘটনা ঘটলেও সামনের সপ্তাহের আগে সেটা জানা যাবে না — সবকিছু দেরি করে ছাপানো খবরের কাগজের অভ্যাস, এতক্ষণ খবরের কাগজ ঘেঁটে সে এইটুকু মাত্র জানতে পেরেছে।

এরপরে নান্টু আর টিপুকে জিজ্ঞেস করা হল তাদের কাজ কতদূর। ওরা সাফ বলে দিল যে ওরা কোনো নৌকা দেখেনি।

কোনো নৌকাই দেখিসনি?

তা দেখেছি। পাট নিয়ে যাচ্ছে মোটা মোটা নৌকা, খেয়াপার করছে আর জেলে নৌকা জাল ফেলে রাখছে!

আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। এরকম একটা দুর্ধর্ষ ডাকাত যদি হাতের কাছে এসে ফসকে যায়, তাহলে কি রকম লাগে? তার উপর আমরা এতোগুলো ছেলে!

আমরা অনেকক্ষণ মনমরা হয়ে বসে থেকে আবার ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। ডাকাতটার যে অবস্থা বেশ কয়দিন তাকে এখানে থাকতে হবে, আমরা তার মাঝে একটা বুদ্ধি ঠিক বের করে ফেলব। আর সবচেয় বড় কথা কয়েকদিনের ভিতরেই স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। রোজার ছুটি। পরীক্ষাও হয়ে গেছে, পড়াশোনার ঝামেলা নেই। আমরা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা খেটে ঠিক ডাকাতটাকে ধরে ফেলব।

অঘটন

ছুটির দিনগুলি কেটে যেতে লাগল খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আমরা ডাকাত সর্দারের আর কোন হদিসই খুঁজে পেলাম না। আমরা চেষ্টা করলাম শহরের সব কয়জন ডাক্তারকে চোখে চোখে রাখতে কিন্তু সেটা সহজ নয়। রোদে ঘুরে ঘুরে আমাদের চেহারা খারাপ হয়ে উঠতে লাগল আর ঘন ঘন বাসায় বকাঝকা পিটুনি খেতে লাগলাম। শেষে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠলাম, মনে হতে লাগল ডাকাত সর্দারকে ধরে কাজ নেই অন্য কিছু করা যাক।

ঠিক এই সময় একটা অঘটন ঘটল। দেয়াল থেকে পড়ে আমার বাম হাতটার কনুইয়ের খানিকটা নিচে ভেঙে গেল। সেদিন দুপুরে আমরা বড়ই খাচ্ছিলাম। আমি বসেছি দেয়ালের উপর, দু পকেট বোঝাই কাঁচা বড়ই, আমার বাম হাতে ঝাল মেশানো লবণ। এমন সময় সাঁই করে একটা কালো ভোমরা মাথার কাছে দিয়ে উড়ে গেল। আমি মাথা নিচু করে তাল সামলানোর চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম, সামলে উঠে কোনমতে ঠিক হয়ে বসলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই কথা নেই বার্তা নেই আমি কি ভাবে জানি পিছন দিকে পিছলে পড়ে গেলাম। ছয় সাত ফুট উঁচু দেয়াল, মাথা মাটিতে ঠুকে যাবে তাই হাত পিছনে দিয়ে তাল সামলানোর চেষ্টা করলাম আর কি আশ্চর্য! হাতটা মট্ করে ভেঙে গেল।

রবিন পরে বলেছিল আমি যখন হাত তুললাম তখন হাতটা নাকি উল্টো দিকে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছিল। যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠলাম, আরেকটু হলে কেঁদেই ফেলতাম, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে পাড়ার মেয়েগুলো ছুটে এল।

কান্নাটাকে ঢোক গিলে ফেলে মুখ বিকৃত করে আমি ডান হাত দিয়ে বাম হাতটা ধরলাম। ভিতরে কোথায় কি লেগে ঝনঝন করে সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় থরথর করে কেঁপে উঠল। রবিন আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কিচ্ছু ভয় নেই, হাড়টা ভেঙে গেছে! ঠিক হয়ে যাবে। তারপর হীরাকে বলল, দৌড়ে যা শফিক ভাই বা অন্য কোন বড় কাউকে ডেকে আন। টোপনকে হাসপাতালে নিতে হবে।

সবাই, বিশেষ করে মেয়েরা ফ্যাকাসে মুখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। শুধু ওদের দেখানোর জন্যেই আমি বললাম, আমি নিজেই পারব। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করে উঠে দাঁড়ালাম।

হাসপাতালে রবিনের আব্বা গম্ভীর মুখে এক্স-রে করলেন। হাতটা তখন কালচে হয়ে ফুলে উঠেছে। পনেরো মিনিটের ভিতর এক্স-রে প্লেট পাওয়া গেল। দেখা গেল দুটো হাড়ই ভেঙেছে। কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত যে দুটো হাড় থাকে, ওটা আমি তখনই প্রথম জানলাম।

ডাক্তার চাচা খানিকক্ষণ এক্স-রে প্লেটটা লক্ষ্য করে আমার কাছে এগিয়ে আসলেন। তারপর এক বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতটা সোজা করে আবার ভাঁজ করে ভীষণ নিষ্ঠুরভাবে ডাক্তার চাচা কি যেন করতে লাগলেন। শফিক ভাই আমাকে শক্ত করে ধরে রাখলেন। কাঁদবো না কাঁদবো না করেও আমি ঠোঁট কামড়ে কেঁদে ফেললাম।

পরে যখন প্লাস্টার অফ প্যারিসের গুঁড়ো মাখানো ব্যাণ্ডেজ দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে প্লাস্টার করে দেয়া হল তখন নেহায়েত মন্দ লাগছিল না। ধবধবে সাদা প্লাস্টারের উপর ডাক্তার চাচা তারিখ লিখে দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, ব্রেভ বয়। ওয়েল ডান।

হাতটা ভেঙে যাবার পর প্রথমে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, পরে দেখা গেল ব্যাপারটা সেরকম খারাপ না। আব্বা তখন তখনই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলেন, আম্মা একটা রংয়ের বাক্স কিনে দেবেন বললেন। অন্যেরা সবাই আমাকে হিংসে করতে লাগল! প্লাস্টার করা হাত নিয়ে আমার স্বাধীনতা অনেকটুকু কমে গেল ঠিকই কিন্তু কয়েকদিনেই অভ্যাস হয়ে গেল। রবিন এক হাতে সব কাজ কিভাবে করে ফেলত এতদিনে আমি বুঝতে পারলাম!

ডাকাত সর্দারের ঝোঁকটা কেটে যাবার পর আমরা ঈদের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ঈদ যতই কাছে আসতে লাগল দিনগুলি যেন ততই লম্বা হয়ে যেতে লাগল! কিন্তু ঈদের দিনটা শেষ হয়ে গেল কিছুক্ষণের ভিতর। ঈদের পর দিনগুলি কাটতে লাগল খুব খারাপ ভাবে। স্কুল খুলতে দেরি নেই আমাদের সবার ভিতরেই একটু অস্বস্তি, চাপা ভয় আর নিরানন্দের ভাব। এর ভিতর আবার একদিন আমার গা কেঁপে জ্বর এল। দুদিন ভুগেই ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছি, চুপচাপ বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে থাকি। সব মিলিয়ে ভয়ানক খারাপ যাচ্ছে সময়টা।

ঠিক সেই সময়ে আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক ঘটনাটা ঘটল।

আমি সারাদিন চুপচাপ শুয়ে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে সন্ধেবেলা একটা গল্পের বই নিয়ে বসেছি। কাহিনীটা খুব জমে উঠেছে—কিভাবে সময় কেটে যাচ্ছিল টের পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ এক সময় রবিন এসে হাজির। আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, একটু বাহিরে আয়।

কোথায়?

আয় না! ও অধৈর্য হয়ে ছটফট করে উঠল।

আম্মা বকবে, ঠাণ্ডা লাগানো নিষেধ।

সে আমি জানি না, রবিন ফিসফিস করে বলল, ব্যাপার আছে! তাড়াতাড়ি—

আমি আম্মাকে কিছু না বলে চুপি চুপি বাইরে চলে এলাম। পেয়ারাতলায় গিয়ে দেখি সবাই দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি এত রাত্তিতে টিপুও আছে, পাশে একটা সাইকেল দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছে। আমাকে দেখে ওরা সবাই ফিসফিস করে উঠল।

সবাই একসাথে বোঝাতে চাইছিল বলে আমার বুঝতে একটু দেরি হল। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম এইমাত্র টিপু আর রবিন খবর এনেছে সেই ভয়ানক ডাকাত সর্দারটা—হাতে গুলি লেগেছিল বলে হাতটা কেটে ফেলেছে, সে তার দলবল নিয়ে নদীতে অপেক্ষা করছে। রাত গভীর হলেই রওনা দিয়ে দেবে।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, তোরা কেমন করে জানলি?

সবাই হড়বড় করে বলার চেষ্টা করল, হীরার গলার স্বর উঠল সবচেয়ে উপরে এবং

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

শ-স-স-স— রবিন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে। সবাই চুপ করতেই টিপু আমাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেয়। কোন জিনিস টিপুর মত গুছিয়ে কেউ বলতে পারে না; হীরা হলে বলতে বলতে দশবার হাসতো, চারবার আগেরটা পরে, আর পরেরটা আগে বলে ফেলত, সবশেষে কিছু বোঝাতে না পেরে ঝগড়া করে ফেলত।

টিপু সংক্ষেপে বলল সে নিজে ডাকাতটিকে আগে কখনো দেখেনি কারণ সে আমাদের সাথে সে রাতে ছিল না। তবু সবার কাছ থেকে যেরকম বর্ণনা শুনেছে সেটি ওর ছোটবোন ঝুমুকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বিশেষ জোর দিয়েছিল হাতের উপর, যে, হাতটা হয়তো কাটা থাকবে। ডাকাতদের নৌকা কি রকম হয় সেটিও রীতিমত ছবি একে ঝুমুকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তারপর ওকে নান্টুর তৈরি টেলিস্কোপটা দিয়ে বলেছিল বাসার ছাদ থেকে নদীর উপরে নজর রেখে যদি সে রকম কোন নৌকা আর সে রকম কোন লোক খুঁজে বের করতে পারে তাহলে ওকে ওর প্রোজেক্টরটি দিয়ে দেবে। ওর ছোটবোন ঝুমুর নাকি অনেকদিন থেকে এই প্রোজেক্টরটার ওপর লোভ। সেই থেকে ঝুমু সময় পেলেই বাসার ছাদ থেকে নদীর দিকে টেলিস্কোপ দিয়ে তাকিয়ে থাকত। ঝুমু কখনও বাসা থেকে বের হয় না, কারও সাথে মেশে না, ওর ডান পাটা একটু বাঁকা, সেজন্যেই বোধ হয়। তাই যতক্ষণ বাসায় থাকত, সারাক্ষণই টেলিস্কোপ দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকত। এর জন্যে টিপু ওকে কদিন পরে পরেই টফির প্যাকেট কিনে দিত।

এরপরে অনেকদিন পার হয়ে গিয়েছে। টিপু আর ঝুমু, দুজনেই ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল। নেহায়েত অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল বলে ঝুমু প্রতিদিন বিকেলে ছাদে উঠে টেলিস্কোপ দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকত। এটা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে টেলিস্কোপে কিছু দেখার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই — যাকে দেখছে সে কিছু টের পাচ্ছে না অথচ তাকে কতো কাছে থেকে দেখা যাচ্ছে।

আজ বিকেলে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা লম্বা সাম্পানে কালোমত একটা হাতকাটা লোককে দেখে ঝুমুর হঠাৎ করে সব কথা মনে পড়ে যায়। নৌকাটি চলে যাচ্ছিল, বাঁকটার কাছে গিয়ে কেন জানি ফিরে এসে শ্মশানের কাছে থামিয়ে রেখেছে।

টিপু বিকেলে ম্যাটিনি শো'তে আলাদীনের সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। ফিরে আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাসায় ফিরতেই ঝুমু খবরটি দিয়ে প্রোজেক্টরটি নিয়ে গেছে।

আমি বললাম, তুমি বুঝলে কেমন করে ওটাই সেই ডাকাত সর্দার? আর এতো দেরি করে খবর এনেছ কেন? সন্ধে হয় সাড়ে পাঁচটায় — এখন আটটা বাজে!

আমার দিকে তাকিয়ে টিপু বলল, ওরা ঠিক ডাকাত কিনা বোঝার জন্যেই তো

এতো দেরি হল।

কি রকম? আমি খুকখুক করে কাশতে কাশতে জিজ্ঞেস করলাম। এই ঠাণ্ডায় গাছতলায় দাঁড়িয়ে শিশিরে ভেজার ফল শুরু হল বুঝি।

বাসা থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে শুধু আবছা নৌকাটাকে দেখা যায় কিছু বোঝা যায় না, তার উপর সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। তাই কাছে থেকে দেখার জন্যে নৌকার কাছে গিয়েছিলাম।

একা?

না সাইকেলে করে এসে রবিনকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের বললি না কেন? আমরা কি—হীরা ফোঁস করে উঠল।

আহ্! শ-স-স— রবিন আবার ঠোঁটে আঙুল চাপা দেয়। বেশি মানুষ নিয়ে গেলে হৈ চৈ হত। আর তোরা ছিলিও না কেউ।

তারপর কি হল? নান্টু তাগাদা দেয়, তাড়াতাড়ি বল, ভাত খেতে হবে।

ভাত? রবিন চোখ পাকায়—এখনো ভাতের চিন্তা করছিস?

আহ্! বল না—

টিপু বলুক এটাই চাইছিলাম কিন্তু রবিনের উৎসাহকে ঠাণ্ডা করবে এমন দুঃসাহস কার?

রবিন বলতে শুরু করল, আমি আর টিপু হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে শ্মশানে "পার্থপ্রতিম মজুমদার" নাম লেখা যে বেদীটা আছে তার পিছে ঘুপচির ভিতরে গিয়ে বসলাম। সরসর করে পায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যাচ্ছে—

সাপ? আমরা আঁতকে উঠলাম।

ঐ হলো। সাপ না হলে অন্য কিছু হবে।

টিপু আস্তে আস্তে বলল, ওগুলো তেলাপোকা ছিল।

হুঁ। রবিন টিপুর দিকে একটু ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার শুরু করল, আমরা যখন ওদের নৌকা থেকে মাত্র দুহাত দূরে ছিলাম —

দু হাত? হীরা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

ঐ রকমই হবে চার পাঁচ হাত।

না-না এতো কাছে না, কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে ছিলাম।

রবিন আবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে টিপুকে দেখে বলল, আমরা সেখান থেকে স্পষ্ট দেখলাম হাত কাটা সেই ডাকাতটা রাইফেলে তেল দিচ্ছে, গুলি ভরে—

টিপু আবার বাধা দিল। গুলি ভরছিল না, নৌকার তলা থেকে বের করে বিছানার নিচে রাখল। আরে ওটা রাইফেল না, রাইফেলের নল থাকে। ওটা বন্দুক, দোনালা।

রবিন খেপে গিয়ে বলল, বেশ তুইই বল। একটা কথাও বলতে দিবি না —

মিশু বিরক্ত হয়ে বলল, এত বাড়িয়ে বলতে হয় নাকি? যা দেখেছিস তাই বল না।

রবিন মুখ খিচিয়ে বলতে শুরু করল। ও যা বলল সেটার আজগুবি অংশগুলি বাদ

দিলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম, ওরা যখন ওদের লক্ষ্য করছিল তখন দুজন নৌকা থেকে নেমে বিড়ি খেতে খেতে তীরে উঠে এল। তাদের আলাপ শুনে বোঝা গেল ইয়াসিন নামের কে একজন টাউনে গেছে, এগারোটার সময় আসবে। ওরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অন্ধকার ছিল, একজন গোবরে পা দিয়ে পিছলে পড়ল, তাই দেখে অন্যেরা সবাই খুব হাসতে লাগল। যে পিছলে পড়েছে সে উঠে দেখে ওর সারা শরীর কাদায় গোবরে মাখামাখি। সে কাপড়, জামা খুলে রাখল ওই বেদীটার উপর—যার পিছনে ওরা দুজন লুকিয়ে ছিল। তারপর কোমর থেকে কি একটা খুলে রাখল — শব্দ শুনে মনে হল ধাতব কিছু। ডাকাতটা যখন নদীতে গোসল করতে নামল—এই শীতের মাঝে, তখন রবিন আস্তে আস্তে কাপড়, জামার ভিতর হতে হাত ঢুকিয়ে সেই ধাতব জিনিসটা বের করে আনল। ভেবেছিল ছোরা টোরা হবে কিন্তু হাতে নিয়ে দেখে রিভলবার! একেবারে সত্যিকারের রিভলবার!

তারপর ওরা আর দেরি করেনি গুঁড়ি মেরে সরে এসে সাইকেলে চড়ে পালিয়ে এসেছে।

রিভলবারটা? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

নিয়ে এসেছি।

নিয়ে এসেছিস? আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কই? দেখা দেখি।

রবিন এদিক সেদিক তাকিয়ে কোমর থেকে রিভলবারটা বের করল, প্যান্টের ভিতর গুঁজে রেখেছিল। দেখি দেখি বলে সবাই হাত বাড়িয়ে দিল। টিপু বলল, খবরদার গুলি ভরা আছে কিন্তু।

আমরা হাতে নিয়ে দেখলাম, বেশ ভারি। এখানে অন্ধকারে ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। মিশু হাতে নিয়ে কোথায় চাপ দিয়ে কড়াৎ করে খুলে ফেলল, অমনি গুলি গুলো খুলে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা হা হা করে উঠতেই মিশু বলল, ঠিক আব্বারটার মতো।

আমাদের খেয়াল হল মিশুর আব্বার রিভলবার আছে, তিনি এখানকার ডি এস পি। মিশু রিভলবার খুলে গুলি ভরতে পারে। সে দেখিয়ে দিল কিভাবে সেফটি ক্যাচ অফ করে ফেলার পর আর গুলি করা যায় না, আবার অন করতেই কিভাবে গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

আমরা গুলিগুলো খুলে নিয়ে ফাঁকা রিভলবার দিয়ে গুলি করার চেষ্টা করলাম। ট্রিগারটা ভীষণ শক্ত, রবিন ছাড়া আর কেউ এক হাতে গুলি করতে পারল না। ওর সব কাজ এক হাতে করতে হয় তাই ওর হাতের আঙুলে দারুণ জোর।

রিভলবারটা রবিন আবার লুকিয়ে ফেলল কেউ দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি করবি? ডাকাতদের কথা থানায় —

থানায় বলে লাভ নাই। আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

রিভলবারটা দেখাব।

তাহলে তোমাকেই ধরবে। বেআইনী অস্ত্র হাতে থাকলেই দশ বছরের জেল।

তাহলে উপায়? আর ওরা তো এতক্ষণে হয়তো রওনাই দিয়ে দিয়েছে।

সবাই চুপ করে থাকল। আমি বললাম তাহলে কি করা যায় বল!

রবিন কাটা হাতটা নাড়তে লাগল, সমস্যায় পড়ে গেলে ও সাধারণতঃ যা করে।

কি হল?

গলা খাঁকারি দিয়ে রবিন বলল, আমরা ঠিক করেছি টিপুর নৌকা দিয়ে আমরা ডাকাত দলটার পিছু পিছু যাব।

শুনে আমার বুকের ভিতর রক্ত ছলাৎ করে উঠল। উত্তাল নদীতে ডাকাত দলের পিছনে আমরা নৌকা নিয়ে ছুটে যাচ্ছি, প্রচণ্ড অট্টহাসির শব্দ, তার সাথে ট্যাট ট্যাট ট্যাট করে গুলি! পালে বাতাস লেগে নৌকা পানির বুক চিরে উড়ে চলছে, সবার চুল উড়ছে বাতাসে, তার মাঝে যুদ্ধ! মুহূর্তে আমার চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্যগুলি ভেসে উঠল। কিন্তু সাথে সাথেই আমার মনে পড়ল আমার বাম হাতটা ভাঙা, প্লাস্টার খুলবে আরো চৌদ্দদিন পরে, মনে পড়ল আমি জ্বরে কাহিল, ঠাণ্ডা লাগানো নিষেধ, সাথে সাথে খুকখুক করে কেশেও উঠলাম।

আমি সব ভুলে গিয়ে বললাম, তাহলে আর সময় কই? আমাদের রেডী হতে হবে না?

রবিন কিছু বলল না, পা দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল।

কি ব্যাপার?

তাহলে শোন—রবিন আবার গলা খাকারি দিল, তোকে আমাদের সাথে নিচ্ছি না।

কেন? আমার গলার আওয়াজ আর্তনাদের মত শোনালেও আমি বুঝতে পারলাম আমাকে সত্যি ওরা নেবে না, আর নেয়া সম্ভবও না। এক হাত ভেঙে পঙ্গু, এখনও জ্বর ভাল করে সারেনি, অনিয়ম করলে মারা যাব, ডাক্তার চাচা বলে গেছেন। তবু ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে আমার বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। রবিন, মিশু, টিপু, সলিল, হীরা, কাসেম, নান্টু সবাই যাবে। ডাকাত দলের পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াবে, আর আমি, এই টোপন কিনা বাসায় বসে থাকব? ভাবতেই দুঃখে দম বন্ধ হয়ে এল।

আমি যাবই। কোন যুক্তি ছাড়াই আমি গোঁয়ারের মত চেঁচিয়ে উঠলাম।

তখন সবাই মিলে আমাকে বোঝাতে বসল। প্রথমে কেউই কথাটি বলতে পারছিল না, কিন্তু একবার বলার পর ব্যাপারটি খুব সহজ হয়ে গেল। টিপু বলল, নৌকা ডুবে গেলে সাঁতরাতে পারবে না, তোমার হাত প্লাস্টার করা।

আর রবিনের যে হাতই নেই!

আমার তো অভ্যাস হয়ে গেছে। এক হাতেই আবার সাঁতরানো শিখেছি! তোর হাত ভেঙেছে মাত্র সেদিন, এখনো হাড় জোড়া লাগেনি।

আর তোর অসুখও কমেনি—হীরা বলল, ঠাণ্ডা লেগে মরে যাবি।

এখনই খুকখুক করে কাশছিস।

হাতটা ধরে নান্টু বলল, শরীরে এখনো অল্প অল্প জ্বর। তুই থাক টোপন, আমরা

যাই।

দুদিনের বেশি লাগবে না। আমরা এসে পড়ব।

এর পরের বার নিশ্চয়ই তোর অসুখ থাকবে না, তখন সবাই মিলে যাব।

আর কাল যখন হৈ চৈ পড়ে যাবে তুমি বুদ্ধি করে সামলে নিতে পারবে। সবাই তো তোমার কাছেই আসবে।

বলবি পিকনিকে গেছি, এসে পড়ব।

আরো সব কথা সবাই বলতে লাগল, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি বুঝতে পারলাম সত্যি ওরা আমাকে নেবে না। দুঃখে অভিমানে চোখে পানি এসে গেল। অন্ধকার তাই কেউ টের পেল না।

আমি মাথা নিচু করে ফিরে এলাম। সবাই বাসার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ওদেরও দুঃখ লাগছিল কিন্তু তাতে আমার দুঃখ কিভাবে কমবে? আমি ঢোক গিলে চোখ মুছে নিলাম। কি হবে দুঃখ করে?

নিঃসঙ্গ অ্যাডভেঞ্চার

অনেকক্ষণ একা একা চুপচাপ বসে ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে, দশটা বেজে গিয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতরেই রবিন, টিপু, সলিল, নাণ্টু, ওরা সবাই বাসা থেকে পালাবে।

আমাকে এরকম চুপচাপ বসে থাকতে দেখে আম্মা ভাবলেন ঠাণ্ডা লাগানোর জন্যে তার বকুনি খেয়ে মন খারাপ করেছি। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, যা বাবা ঘুমো গিয়ে। জ্বর এসেছিল আর?

আমি মাথা নাড়লাম, না। তারপর খুব ক্লান্ত ভাবে আমার আর রঞ্জুর শোবার ঘরটাতে এসে ঢুকলাম। রঞ্জু বিছানায় বসে মশারি ফেলে চারিদিকে গুঁজে দিচ্ছিল। আমি রাস্তার দিকে জানালাটা খুলে দিলাম সাথে সাথে হু হু করে বাতাস এসে ঢুকল।

ভাইয়া, জানালা বন্ধ করে দাও, বাতাস আসছে।

চুপ। আমি রক্তচক্ষু করে তাকালাম, কথা বলবি নে।

অন্য যে-কোন সময় হলে রঞ্জু পাল্টা জবাব দিত, ঝগড়া করত আম্মাকে নালিশ করত, কিন্তু আজ কিছু বলল না। সত্যিই চুপ করে শুয়ে পড়ল।

লাইট নিভিয়ে আমি জানালার কাছে বসে থাকলাম। ওরা যখন যাবে তখন আমি দেখব। ঠাণ্ডা বাতাসটা একেবারে হাড়ের ভিতর দিয়ে কেটে কেটে যাচ্ছিল, তাই বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস যেন আমার বুকের ভিতর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে। আমার ঘুম আসছিল না, ইচ্ছে হচ্ছিল কাঁদি। একটু পরেই রঞ্জু ঘুমিয়ে

কাদা হয়ে অভ্যাসমত আমার গায়ের উপর পা তুলে দিতে লাগল আর আমি ঝটকা মেরে তার পা সরিয়ে দিতে লাগলাম।

এক সময় সবাই শুয়ে পড়ল। ঘড়ির টিকটিক ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে সেই বিশেষ ধরনের টুকটাক শব্দ শোনা যেতে লাগল যেগুলি রাত জাগলেই শোনা যায় কিন্তু কি জন্যে হচ্ছে বোঝা যায় না। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম—ঠিক সেই সময়ে জানালায় আবছা ভাবে রবিনকে দেখা গেল।

লাফিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিয়ে সন্তর্পণে উঠে বসলাম। রবিন জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, মন খারাপ করিস নে। তারপর গলা আরও নামিয়ে বলল, নান্টু ধরা পড়ে গেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ! ঐ শুনিস না ওদের বাসার আওয়াজ?

আমি কান পেতে শুনলাম সত্যি সত্যি খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। রবিন বলল, যাই!

আমি শুকনো গলায় বললাম, যা!

রবিন লাফিয়ে নেমে গেল। একটু দূরে অন্যেরা দাঁড়িয়েছিল আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। চোখে আর ঘুম আসে না। নান্টুদের বাসা থেকে গোলমালের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম এখন ওরা চৌরাস্তায় পৌঁচেছে, একটু পরেই স্কুল পার হয়ে নদীর ঘাটে পৌঁছে যাবে। আমি কল্পনা করতে লাগলাম ওরা অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে হেঁটে যাচ্ছে, নৌকায় উঠছে, সবকিছু ঠিকঠাক করে নিয়ে টেলিস্কোপে ডাকাতদের নৌকাটাকে লক্ষ্য করছে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে কখন ওটা ছাড়বে। রবিন গালিগালাজ করছে, টিপু তার স্বভাবসুলভ শান্ত ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে রবিনের কথার উত্তর দিচ্ছে। এক সময় নৌকা ছেড়ে দিল — অন্ধকার রাত, আকাশে তারা মিটমিট করছে, ঠাণ্ডা বাতাস হিল হিল করে বইছে, ছপাৎ ছপাৎ করে হীরা আর মিশু দাঁড় টানছে। অন্ধকারে আবছাভাবে তীরের গাছপালা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে।

ভীষণ যন্ত্রণায় আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। আমি উঠে বসলাম আর ঠিক তক্ষুনি, কিছু না ভেবেচিন্তে হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম আমিও ওদের সাথে যাব। যেভাবেই হোক।

এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই রওনা দিয়ে দেয়নি, ডাকাতদের নৌকাটা কখন ছাড়বে ঠিক কি? আর ছেড়েই যদি দেয় আমি নদীর তীরে তীরে দৌড়িয়ে ঠিক ধরে ফেলব। আমি একটু চিন্তা করে নিলাম তারপর খুব আস্তে আস্তে উঠে কাজ শুরু করলাম।

চৌকির নিচেই ক্যানভাসের খালি ব্যাগটা পেয়ে গেলাম। বালিশের নিচে ছিল সোয়েটারটা, সেটা পরে ফেললাম। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে গরম প্যান্টটা বের করতে

অনেক সময় লাগল। খাকী হাফ প্যান্টটা খুঁজে বের করতেও অনেক সময় নষ্ট হল। আলো থাকলে কি সহজেই না সবকিছু পাওয়া যায়। হকি সু গুলি পরে ফেললাম, মোজা ছাড়াই। ওগুলি এই অন্ধকারে কে খুঁজে বের করবে? এখন দরকার একটা অস্ত্র, চাকু বা ঐ জাতীয় কিছু, কিছু টাকা, একটা টর্চলাইট, একটা কম্বল আর ওষুধগুলি।

ওষুধের শিশিগুলি বের করার জন্যে যেই টেবিলে হাত দিয়েছি অমনি মিকচারের শিশিটা ঠক্ করে টেবিলে পড়ে গেল। আমি আঁতকে উঠে শিউরে উঠলাম, এখন নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ঘুম থেকে উঠে যাবে! হলোও তাই, আব্বা পাশের ঘর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললাম, আমি আব্বা!

ও। কি করিস?

পানি খাব। বলেই খুট করে লাইট জ্বাললাম, অন্ধকারে পানি খাওয়া স্বাভাবিক নয়। আমার কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, আব্বা যদি একবার উঠে আসেন তাহলে শার্ট প্যান্ট জুতা পরা অবস্থায় দেখলে বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। ভাগ্য ভাল আব্বা উঠলেন না। আমি শব্দ করে পানি খেলাম, আর আলোতে পরিষ্কার সবকিছু দেখতে পেয়ে মোজা জোড়া খুঁজে বের করে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম। তাক থেকে রঞ্জুর মাটির ব্যাঙ্কটা নামিয়ে ব্যাগে ভরে ফেললাম, মাস তিনেক ধরে সে ওখানে পয়সা জমিয়ে যাচ্ছে। ওষুধের শিশি, ট্যাবলেটগুলি পকেটে ভরে ফেলে আমি আবার লাইট নিভিয়ে দিলাম, পানি খেতে বেশি সময় লাগার কথা না! অন্ধকারে পা টিপে টিপে বিছানার উপর থেকে কম্বলটা নিয়ে ভাঁজ করে ফেললাম, এক হাতে ভাঁজ করা কি সোজা ব্যাপার? চাকু আর টর্চ পাওয়া গেল না কিন্তু আর দেরি করা যায় না। আমি ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বিদায় নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আমার হঠাৎ কেন জানি বুকের ভিতর ফাঁকা ফাঁকা লাগল। দরজা খোলার সময়ে এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেয়ে কাজ নেই, কিন্তু মনকে শক্ত করে খুব ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ছিটকিনি খুলে ফেললাম, ওটা আবার খোলার সময় মাঝে মাঝে শব্দ করে। তারপর একেবারে অন্ধকার রাস্তায়।

কাল ভোরে যখন দেখবে এ পাড়ার সব ছেলে উধাও তখনই সবাই বুঝে নেবে, তার উপর নান্টু তো থাকলই।

বাইরে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার! রাত কয়টাই বা হয়েছে অথচ কোথাও একটি লোক নেই। আমি রাস্তার ধার ঘেঁষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটতে লাগলাম। মোড়টা পার হলেই সার্কিট হাউজের পাশের সেই বটগাছটা — যেখানে নাকি রাত গভীর হলেই জ্বিনেরা নাচগান করে! জায়গাটা একা কেমন করে পার হব ভেবে আমার এই শীতেই কপাল ঘেমে উঠতে লাগল।

আচ্ছন্নের মত আমি দ্রুত পায় হাঁটতে লাগলাম, মাঝে মাঝে নিজের পায়ের শব্দ শুনে আমি নিজেই চমকে উঠছি। যত দোয়া দরুদ জানা ছিল আমি একটির পর একটি

আওড়ে যাচ্ছিলাম, নদীর ঘাটে পৌঁছার বেশি বাকি নেই। হঠাৎ রাস্তা ফুঁড়ে কোত্থেকে একটি লোক হাজির হল, দেখে আমার হৃদপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে এসে ধ্বক ধ্বক করতে লাগল। লোকটি বিরাট, ছোটখাট পাহাড়ের মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করতে লাগল। আমি খুব সন্তর্পণে রাস্তা পার হয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগলাম। লোকটি ম্যাচের কাঠির আলোতে আমাকে দেখার চেষ্টা করল বলে মনে হল। যখন দৌড় দেব কিনা ভাবছিলাম তখন সে কাঠিটা ফেলে আপন মনে বিড়বিড় করে জড়িত স্বরে বলল, লে বাবা! শিয়াল টিয়াল নাকি? তারপর উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল, দেখলাম অল্প অল্প টলছে।

এত বিপদের মাঝেও আমার হাসি পেল। লোকটা আমাকে কিনা শেষ পর্যন্ত শেয়াল ভাবল? নিশ্চয়ই মদ খেয়েছে। এদিকে কাছেই কোথায় মদের দোকান আর খারাপ জায়গা টায়গা আছে।

কিভাবে কিভাবে শেষ পর্যন্ত আমি নদীর তীরে এসে পৌঁছে গেলাম। পথে দুজন টহল পুলিসকে দেখে শুধু খানিকক্ষণ গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম, ওরা দেখলে মুশকিল হত। বাজারটার মুখে একটা কুকুরও খুব বিরক্ত করেছিল, ঘেউ ঘেউ করে মনে হচ্ছিল বাজারের সব লোক তুলে ফেলবে। আমি অবিশ্যি খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে এসেছি। কিন্তু নদীর তীরে এসে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। খুব উদ্বেগ নিয়ে যেখানে টিপুর নৌকা বাঁধা থাকে সেখানে ছুটে গিয়ে দেখি ওখানে কিছু নেই। কাছে গিয়ে দেখলাম টিপুর নৌকার শিকলটা পানিতে ডুবে আছে। আর কিছু নেই—কোন চিহ্ন নেই, ওরা চলে গেছে!

কতক্ষণ আগে গেছে? কোনদিকে গেছে? ভাবতে গিয়ে অসহায় বোধ করলাম। হঠাৎ করে আমি ভীষণ দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। মনে হল সেখানেই মুখ ঢেকে বসে পড়ি। এতক্ষণ যে জোরটা আমাকে ছুটিয়ে এনেছে সেটা যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। ঠিক তক্ষুণি আমার মনে হল প্রতিমুহূর্তে ওরা আরো দূরে চলে যাচ্ছে। এক্ষুনি রওনা দিতে হয়। কিন্তু কোন্‌দিকে?

নদীতে তখন মাত্র ভাঁটা শুরু হয়েছে, কয়েকটা কচুরিপানা ভাসতে ভাসতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। আমার মনে হল ডাকাতেরা নিশ্চয়ই ভাঁটার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ভাঁটা শুরু হওয়ার পর এখন নিশ্চয়ই স্রোত ঠেলে উল্টো দিকে যাবে না। আমি ভাল হাতটা দিয়ে টেনে ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলাম তারপর দক্ষিণ দিকে ছুটলাম। বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত মনে হল একটু দূরেই সেই শ্মশানটা!

অন্ধকার রাত। হাজার হাজার তারা আর একটা বিবর্ণ চাঁদের আলোতে আমি ছুটে চলেছি। মাঝে মাঝে দেখছিলাম নদীতে কোন নৌকা দেখা যায় কিনা। কাটা গাছ, লতাপাতা কাদা, গোবর কোন কিছুকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে

লাগলাম, প্লাস্টার করা বাম হাতটা ভারি অসুবিধা করছিল। কম্বলটা মনে হচ্ছিল অতিকায়, ব্যাগটা মনে হচ্ছিল সীসে দিয়ে ভরা। আমার দৌড়ের সাথে সাথে ওগুলি ঝকরঝকর করে কাঁধে লাফাতে লাগল, মাঝে মাঝে চোয়ালের সাথেও ঘষে যাচ্ছিল।

শ্মশানের পাশ দিয়ে যখন ছুটে যাই হঠাৎ আমার তখন মনে হল পিছনে পিছনে কেউ আমার সাথে ছুটে আসছে, এই বুঝি ধরে ফেলল — এই বুঝি ধরে ফেলল! আমি পিছনে ফিরে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলাম না, যদি দেখি সত্যিই কেউ আসছে! ভয়ে আতঙ্কে আমি মৃত প্রায় হয়ে গেছি হঠাৎ দেখি নদীতে কালোমত একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে। কার নৌকা, কিংবা আসলে নৌকাই কিনা আমি জানি না — তবু আশায় ভর করে, ছুটতে ছুটতে প্রাণপণে চেচাঁলাম, রু...বি...ন...

ছুটতে ছুটতে ওটার কাছাকাছি এসে দেখি নৌকাই বটে, তবে টিপুর নৌকা না। সেটাতে ছই ছিল না। হতাশায় আমি ভেঙে পড়লাম, ক্লান্তিতে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম, তবুও আমি থামলাম না। সামনে নিশ্চয়ই ওরা আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলকের মত রবিনের গলার স্বর শুনলাম, টো...প...ন...কোথায়?

আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। ওটা টিপুর নৌকাই, ছই লাগিয়ে নিয়েছে। আমি ভাল হাতটা নাড়তে নাড়তে ছুটে গেলাম। নৌকাটা তীরের দিকে ছুটে আসতে লাগল। পানিতে বেশ কিছু দূর থাকতেই আমি জুতো টুতো নিয়ে লাফিয়ে পড়লাম। ওরা আমাকে টেনে নৌকায় তুলে ফেলল।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, যাক, তোদের পাওয়া গেল তাহলে।

হীরা এক ঝটকায় নৌকাটাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে যেতে লাগল। অন্যেরা আমাকে ঘিরে বসল। আমি ভিজে জুতো এক হাতে খুলতে খুলতে বললাম, ভেবে দেখলাম আমি একলা একলা থাকতে পারব না। তাই—

সবাই খুশিতে আমাকে জাপটাজাপটি করতে লাগল, রবিন বলল, খুব ভাল করেছিস। তোকে ফেলে এসে আমার এত খারাপ লাগছিল। একটু আগে বলছিলাম ফিরে গিয়ে তোকে নিয়ে আসি।

টিপু বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল টোপন এসে পড়বে। তোমরা তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার সত্যি মনে হচ্ছিল।

মিশু আমার জুতো খুলতে সাহায্য করতে করতে বলল, তোর সাহস আছে সত্যি!

সলিল দাঁড়টা ছপাৎ করে ফেলে এক টান দিয়ে বলল, টোপনের সত্যি খুব সাহস।

একলা একলা কেমন শ্মশানের ভেতর দিয়ে চলে এল!

আমি খুশিতে হাসতে হাসতে বললাম, ডাকাতদের নৌকাটা কতদূর?

ও! অনেক সামনে। এই দ্যাখ, বলে রবিন টেলিস্কোপটা আমার হাতে দিল। ঐ ছোট্ট আলোটাতে ফোকাস কর।

ফোকাস করে আমি টিমটিমে একটা হারিকেন দেখতে পেলাম, ওটাই নাকি নৌকাটা! আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে মনে হল কাসেমকে দেখছি না। বললাম, কিরে কাসেম কই?

বুঝলাম না; ও আসল না কেন? বোধ হয় আসার ইচ্ছে নেই।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

আমি বললাম, আমি না আসলে তো তোদের মানুষই কম পড়ত। কাসেমও নেই নান্টুও নেই।

তুমি এসেই আমাদের লাভ কি! টিপু হাসতে হাসতে বলল, হাতখানা ভাঙা, তার ওপর জ্বর! তুমি বরং ভিতরে গিয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকো। দেখো কেমন চমৎকার চাটাইয়ের ছই তৈরি করেছি, ভিতরে ঠাণ্ডা বাতাস আসতে পারবে না।

রবিন গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ টোপন, ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাক। একটা ট্যাবলেট খেয়ে নিবি নাকি? অনেক ওষুধ এনেছি।

ওর ভাবখানা ওর আব্বা ডাক্তার তাই সেও হাফ ডাক্তার! আমি বললাম, না, আমি নিজের ওষুধগুলিই এনেছি।

আমি পকেট থেকে মিকচারের শিশি, ট্যাবলেটের প্যাকেট বের করতে লাগলাম। হীরা বাইরে থেকে চেঁচাল, আধাঘণ্টা হল কিনা দ্যাখ। আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। টিপুর হাতে একটা জ্বলজ্বলে ঘড়ি। দেখে বলল, আর মাত্র চার মিনিট।

হীরা জোরে জোরে বৈঠা চালাতে লাগল। আমি ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু দুর্বল, একটু অসুস্থ লাগছিল কিন্তু খারাপ লাগছিল না মোটেই। রিভলবারটির কথা মনে হল, উঠে বসে অকারণেই গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রিভলবারটি এনেছিস তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ! ওসব ভুল করি নাকি? রবিন দাঁত বের করে হাসল। বলল, তুই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমো।

হ্যাঁ তুমি বিশ্রাম নাও। টিপুর গলা শুনতে পেলাম। অন্ধকারে মুখের ভাব দেখা যায় না; আন্তরিক সুরটা শুধু ধরা পড়ে।

শুয়ে শুয়ে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। হঠাৎ মনে হল, যদি নৌকা ডুবে যায়? তাহলে এক হাতে সাঁতরাতে না পেরে টুপ করে ডুবে যাব। তার উপর স্রোতের কি টান! আমি জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে দিলাম। শুধু খারাপ খারাপ জিনিস চিন্তা

করলে কি আর কোন কাজ করা যায়!

আমি ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। শুনতে পেলাম সলিল গুনগুন করে গান গাচ্ছে। ওর গানের গলাটা চমৎকার।

প্রথম সকাল

আমার ঘুমটা গাঢ় হল না, অসুস্থ হলে হয়ও না। আমি আধো ঘুম আধো জাগরণে আবছা আবছা ভাবে ওদের কথাবার্তা শুনছিলাম। ওরা মাঝে মাঝে জায়গা বদল করছে টের পাচ্ছিলাম, একবার হীরাকে খানিকক্ষণ গালিগালাজ করতেও শুনলাম। কিছু সময় কে যেন আমার পাশে শুয়ে থাকল। শেষ রাতের দিকে মনে হল নৌকাটা থামানো হয়েছে।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করব করব ভেবে আবার ঘুমিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। বিরাট বড় গোলক ধাঁধায় আটকে পড়ে ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে ঘুরছি আর প্রতিবারই হিসেব ভুল করে একই দিকে সরে আসছি। লাল নীল হলুদ রংয়ের চক্র ছোট থেকে বড় হয় ক্রমাগত মিলিয়ে যাচ্ছিল আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছিল। দেখতে দেখতে একসময় আমার ঘুম ভেঙে গেল, ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি উঠে বসে আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম ঐটুকু জায়গায় জড়াজড়ি করে সবাই শুয়ে আছে। বাইরে রবিন শুধু কম্বল গায়ে জড়িয়ে প্রেতের মত বসে আছে। আমি ডাকলাম রবিন —

উঁ।

নৌকা থামিয়ে রেখেছিস?

হ্যাঁ। ডাকাতেরাও থেমেছে।

কতদূর আছে?

বেশিদূর না।

কি করছে?

কিছু না। জোয়ারের সময়টুকু বোধ হয় ওরা এখানেই থাকবে। তোর জ্বর আছে এখনো?

নাহ্। পানি আছে খাবার?

চারিদিকে এতো পানি? খা না কত খাবি।

ধেৎ! নোংরা!

ঐ খেতে হবে! আমরাও এই খাচ্ছি। বলে সে একটা মগ বের করে নদী থেকে পানি তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি একটু ইতস্তত করে ঢকঢক করে খেয়ে ফেললাম। বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল।

কয়টা বেজেছে?

হাতে বাঁধা টিপুর ঘড়িটা দেখে রবিন বলল, পৌনে পাঁচ।

সকাল হয়ে গেছে তাহলে।

হ্যা—কি সুন্দর লাগছে, উঠে এসে দ্যাখ। রবিন হাত দিয়ে বাইরে দেখাল।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসে বসলাম। কুয়াশা পড়ে নৌকার পাটাতন ভিজে আছে। জোয়ারের পানি ছলাৎ ছলাৎ করে নৌকার উপর আছড়ে পড়ছে। চারিদিকে ধোঁয়াটে একটা ভাব। আলো যেন গুঁড়ো করে কেউ পাউডারের মত ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমি একটু বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইলাম। একবারও মনে হল না জ্বর নিয়ে বাসা থেকে পালিয়ে ডাকাতের পিছু পিছু নৌকায় বসে আছি। নদীর বাঁক, দুধারে গাছ-গাছালি, আবছা মাটির ঘর, আকাশে হালকা মেঘ, পুব দিকে লালচে আভা, শুকতারা জ্বলজ্বল করছে, সব মিলিয়ে ভারি আশ্চর্য।

রবিন উঠে দাঁড়াল, বলল, এখন টিপুর পাহারা, পাঁচটা বেজে গিয়েছে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ছইয়ের ভিতর ঢুকে টিপুকে খোঁচাতে লাগল, এই টিপু ওঠ! এই টিপু—

টিপু বার দুয়েক উ আঁ করল কিন্তু উঠল না। দেখে আমার মায়া হল, আমি রবিনকে বললাম, শুধু ওকে ডাকিস না, আমি পাহারা দিছি। বেচারা ঘুমাক।

তুই? তোর না জ্বর?

ভাল হয়ে গেছে।

দেখিস আবার—বলে রবিন শুয়ে পড়ল এবং শুতে না শুতেই ঘুম। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে আছে।

আমি এই বিজন নদীর তীরে একলা নৌকায় বসে রইলাম। সামনে ডাকাতের নৌকাটা ভাঁটা শুরু না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না, বোঝাই যাচ্ছে। আমি অলস ভাবে বসে থাকলাম, মাঝে মাঝে নৌকাটা দেখছিলাম। শীত পড়েছে। মাথায় হিম পড়ে ভিজে যাচ্ছে। আমি কম্বল দিয়ে ভাল করে মাথা ঢেকে নিলাম। ওদিকে নৌকার ভিতরে সবাই গাদাগাদি করে তখনো ঘুমোচ্ছে।

খুব ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এল। আশেপাশে গাছপালা বাড়িঘর স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটু দূরে খানিকটা ফাঁকা মত জায়গা তার আশেপাশে ছোট ছোট ঘর — বাজার টাজার হবে হয়তো। লোকজন গামছা ঘটি নিয়ে ইতস্ততঃ হাঁটাহাঁটি করছে। কেউ কেউ দাঁতন দিয়ে দাঁত ঘষে নদীর পানি দিয়ে কুলকুচা করতে লাগল। কয়েকজন আমাদের নৌকার খুব আশেপাশে এসে সশব্দে ওজু করতে লাগল। আমার শুধু ভয় করছিল, এক্ষুনি হয়তো কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে বসবে। কিন্তু করল না, আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো নৌকা বাঁধা ছিল সে জন্যেই কোন রকম সন্দেহ করেনি বোধ হয়।

আমি ডাকাতদের নৌকাটা দেখছিলাম, লম্বা পানসী। কালো কুচকুচে রং, ছইটাও কালো। একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ঢেউয়ের সাথে সাথে নড়ছিল না পর্যন্ত। ওটাকে দেখতে দেখতে আমি কেমন জানি বুকের ভিতর শিহরণ অনুভব করলাম।

ওরা সবাই অনেক বেলা করে উঠল। হৈ চৈ করে হাত মুখ ধুয়ে উৎসাহে একেকজন টগবগ করতে লাগল। রবিন এর মাঝে বার দুয়েক রিভলবারটায় গুলি ভরে আবার খুলে রাখল। বিছানার তলা থেকে একটা লম্বা চাকুও বের করে পরীক্ষা করে দেখল। এরপরে কি করা হবে ঠিক করতে গিয়ে দেখা গেল ভীষণ খিদে পেয়েছে।

আমাদের কাছে পয়সা-কড়ি খুব বেশি নেই। রঞ্জুর ব্যাঙ্কটা ভেঙে মাত্র তিন টাকার মত পাওয়া গেছে। কতদিন এখানে থাকতে হবে ঠিক কি? কাজেই খুব সাবধানে পয়সা খরচ করতে হবে। হীরা আর সলিল বের হল নাস্তা কিনতে। আমরা বসে বসে একটা প্ল্যান বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

টিপু বলল, এখানে যদি আশেপাশে থানা থাকে তাহলে আমরা খবর দিয়ে আসতে পারি।

কিসের?

কেন? ডাকাতদের ধরে নিয়ে যাক।

রবিন মুখ খিঁচিয়ে বলল, তাহলে এতো কষ্ট করে এখানে এলাম কি জন্যে? একটা ফাইট —

ফাইট?

বাঃ! রিভলবার, ড্যাগার নিয়ে এসেছি কি খাওয়ার জন্যে? যুদ্ধ করব না?

মিশু ইতস্তত করে, যুদ্ধ! কিভাবে করবে? ওরা কতোজন, কতো বন্দুক! আমরা এই কয়জন, তার উপর দুজনের মাত্র একটি করে হাত চালু!

তুই বাসায় চলে যা। রবিন রক্তচক্ষু করে তাকাল, বাসায় গিয়ে রীনা, স্বপ্নাদের সাথে বুড়ী-চি খেলগে—যা!

টিপু একটু নড়েচড়ে বলল, রবিন তুমি শুধুশুধু এতো সব কথা বলছ। যুদ্ধটা করবে কিভাবে?

ও! তুইও তাহলে বুড়ী-চি খেলবি?

টিপু একটুও না ক্ষেপে বলল, বাজে কথা বল না। আমাকে আগে বুঝিয়ে দাও—যুদ্ধটা কিভাবে হবে?

কেন? আমরা ইয়ে—মানে, যখন ওরা আর কি—ইয়ে—রবিন মাথা চুলকাতে লাগল।

বল। টিপু গম্ভীর হয়ে পানিতে পা নাচাতে লাগল।

সে যখন হবে তখন দেখা যাবে।

বাঃ! একটা প্ল্যান নেই কিছু নেই, শুধু বললেই হবে?

এই সময়ে সলিল আর হীরা এক ছড়া কলা আর একটা মস্ত বড় ঠোঙা নিয়ে হাজির হল। সলিল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, লোকগুলো কি বোকা! এতগুলো কলা পঁচিশ পয়সায় দিয়ে দিল!

হীরা দুহাতে ঠোঙাটা উঁচু করে বলল, বল্ দেখি এখানে কতোর মুড়ি?

বুঝতে পারলাম সস্তায় কিনে এনেছে তাই মজা করার জন্যে বললাম, কতো আর হবে, দু পয়সার হবে। নাকি চার পয়সা?

হীরা মুখ খিঁচিয়ে বলল, হ্যাঁ, মুড়িওয়ালা তোমার শ্বশুর কিনা! আধাসের মুড়ি চার পয়সা! আমরা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম, কতো?

পাক্কা পঞ্চাশ পয়সা!

আমরা মুড়ি গুড় আর কলা খেতে লাগলাম। এমন সুন্দর শীতের সকাল, নদীর পানিতে নৌকায় বসে মুড়ি খাওয়া, ভারি চমৎকার লাগছে। বাসার কথা মনে হল। নিশ্চয়ই সবাই এখন খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। আমার একটু মন খারাপ হয়ে গেল।

আমরা আবার ডাকাত ধরার পরিকল্পনা করতে লাগলাম। রবিন বারবার করে বলল সে একটা যুদ্ধ না করে কিছুতেই পুলিসে খবর দিয়ে ডাকাত ধরিয়ে দেবে না। কিন্তু যুদ্ধটা কিভাবে হবে সেটি সে কিছুতেই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারল না। আমি শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে বললাম, এক কাজ করলে হয় না?

কি? সবাই আমার দিকে তাকাল।

আমরা কিছুতেই ডাকাতগুলির পিছু ছাড়ব না। আজ হোক কাল হোক ডাকাতগুলি নিশ্চয়ই কোথাও ডাকাতি করবে। আমরা ঠিক সে সময়ে তাদের বাধা দেব। এদিকে আগে থেকে পুলিসে খবর দেয়া থাকবে—ব্যাস একেবারে হাতেনাতে গ্রেপ্তার।

ইহ্! সব যেন তোর ইচ্ছেমত হতে থাকবে! আমি অসুস্থ দেখে রবিন বেশি মেজাজ দেখাল না, বলল, ডাকাতেরা কখন ডাকাতি করবে তুই জানবি কেমন করে?

বাঃ! আমরা ডাকাতদের পিছু পিছু আছি না?

বেশ, তা না হয় জানলে, টিপু জিজ্ঞেস করল, এতো অল্প সময়ে পুলিসে খবর দেবে কেমন করে?

কেন? অসুবিধে কি? আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, আমরা যখন দেখব ডাকাতেরা ডাকাতি করতে রওনা হচ্ছে, তখনি কয়েকজন কাছাকাছি থানায় খবর দিয়ে আসবে।

বলতে সোজাই, করতে কঠিন। মিশু বলল, একেকটা থানা কত দূর দূর জানিস? দশ পনেরো মাইলের কম না।

মিশুর আব্বা ডি এস পি, কাজেই থানা টানা সম্পর্কে তার কথা আমি উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

টিপু অনেকক্ষণ ভেবে বলল, আমরা যদি আগে জানতে পারি ওরা কবে কোথায় ডাকাতি করবে তাহলে টোপনের বুদ্ধিটা কাজে লাগানো যেতে পারে।

সবাই একটু চিন্তা করে সায় দিল. কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওদের পরিকল্পনা আগে থেকে জানা যায় কেমন করে?

ওরা তো মাইক ভাড়া করে চেঁচিয়ে বেড়াবে না যে আমরা অমুক দিন অমুক জায়গায় এতটার সময় ডাকাতি করব! রবিন বিরক্ত হয়ে বলল, এর থেকে সোজাসুজি একটা ফাইট দেয়া কতো ভাল!

পুলিস কেলেঙ্কারি

বেলা চড়ে এলে নৌকায় রান্নার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। বাসনপত্র কম আনা হয়েছে। তবু যাহোক কাজ চালান যেত কিন্তু ভাতটাই কিছুতেই সেদ্ধ করা যাচ্ছে না। টিপু বাসা থেকে কেরোসিনের চুলা নিয়ে এসেছিল সেটি মাঝে মাঝে হঠাৎ দপ করে বিরাট বড় শিখা নিয়ে জ্বলে ওঠে। হাত পুড়ে, গুঁড়ো মশলা চোখে ঢুকে বিচ্ছিরি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে টিপু, সলিল আর মিশুকে বসিয়ে রেখে আমি হীরা আর রবিন বেড়াতে বের হলাম। উদ্দেশ্য ডাকাতদের নৌকাটা কাছে থেকে লক্ষ্য করব, সেই ফাঁকে বাজারটাও ঘুরে আসব।

গায়ের চাদরটা খুব ভাল করে গায়ে জড়িয়ে আমি উল্টো দিক থেকে ঘুরে এসে খুব অন্যমনস্কের ভাব করতে করতে ডাকাতদের নৌকাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভিতরে প্রায় খালি গায়ে বসে থাকা কালো কুচকুচে লোকগুলি আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল। আমি উদাস ভাবে চোখ ঘুরিয়ে নৌকাটার খুব পাশে দিয়ে হেঁটে গিয়ে নদীতে হাঁটু পানিতে নেমে হাত মুখ ধুতে লাগলাম। ঠাণ্ডা পানিতে সারা শরীর শিরশির করে উঠল কিন্তু উপায় কি? আমি কান তীক্ষ্ণ করে ওদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু চাপা গলায় ঝগড়ার সুরটাই ধরা পড়ল, কোন কথা বোঝা গেল না।

একটু পরে আমি উঠে এলাম। আড়চোখে ওদের লক্ষ্য করে শার্টের হাতা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রবিন আর হীরার কাছে ফিরে এলাম। ওরা অল্প দূরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। রবিন জিজ্ঞেস করল, কিছু বুঝতে পারলি?

কিচ্ছু না!

কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল?

না, শুধু ঝগড়া করছে। আমার দিকে এমন কড়া চোখে তাকাল—

সত্যি?

সত্যি! আর আমাকে দেখেই ওরা ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল। কিচ্ছু শোনা যায় না।

এবারে তাহলে আমি ওদের কাছ থেকে ঘুরে আসি। হীরা শার্টের হাতা গুটিয়ে প্রস্তুত হতে থাকে।

না, এক্ষুনি না। রবিন গম্ভীর ভাবে বলে, তাহলে সন্দেহ করবে। চল বাজার থেকে ঘুরে আসি।

আমরা বাজারটা ঘুরতে গেলাম। বুধবার করে সেখানে হাট হয় তখন নাকি বাজার খুব জমে ওঠে। আজ মাত্র সোমবার। আমরা সেই ছোট বাজারটাই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। মাছের বাজারে মাছের আঁশটে গন্ধে থাকা যায় না। ছোট ছোট কুচো মাছের ভাগা ছ পয়সা করে দাম; একটা মাঝারি রুই মাছ হীরা দাম করল, চার টাকা, সাড়ে তিন টাকাতে দিয়ে দিতে পারে। কিছু কই মাছও আছে দেড় টাকা কুড়ি। এক পাশে আলু পটল টমেটো এই সব তরিতরকারি। দুই পয়সা দিয়ে রবিন দুটো আতা কিনল, ভারি মিষ্টি খেতে। একটা বড় বট গাছের নিচে লাল টিনের ঘরে পোস্ট অফিস, আমি একটা পোস্ট কার্ড কিনলাম নান্টুকে চিঠি লিখব বলে। রবিন অবিশ্যি চেঁচামেচি করতে লাগল এখন চিঠি লিখলে পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে আমাদের খুঁজে বের করে ফেলবে।

বাজারের শেষ মাথা থেকে বড় মাটির সড়ক চলে গেছে। একটু দূরে একটা পাকা দালান। বাইরে সেন্ট্রি। পাহারা দিচ্ছে দেখে বুঝতে পারলাম ওটি হচ্ছে থানা। কাছে গিয়ে দেখলাম নীল রংয়ের উপর সাদা রং দিয়ে থানার নাম লেখা। রবিন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার আর হীরার দিকে তাকাল। আমরা থানাটাতে কতজন পুলিস আছে অনুমান করার চেষ্টা করলাম, পরে প্রয়োজন হতে পারে।

হঠাৎ করে রবিনের খেয়াল হল আমরা অনেকক্ষণ হল ডাকাতের নৌকাটা ছেড়ে এসেছি, ওটাকে একনজর দেখে আসা দরকার। ছেড়েই দিল কিনা কে জানে!

তাড়াতাড়ি আমরা বাজারটার মাঝে দিয়ে হেঁটে নদীর তীরে রওনা দিলাম। মাছ বাজারের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম একটা খাকী পোশাক পরা ঢিলেঢালা পুলিস মাছ দাম করছে। লোকটাকে কেমন একটু চেনা চেনা মনে হল। হয়তো মিশুদের বাসায় দেখে থাকব। পা চালিয়ে নদীর তীরে এসে দেখি দূরে ডাকাতদের নৌকাটা এখনো দেখা যাচ্ছে, আরো দূরে আমাদের নৌকাটা। ডাকাতদের নৌকাটা ঢেউয়ের সাথে সাথে অল্প অল্প দোল খাচ্ছিল। একজন ডাকাত মাটির গামলায় করে কি যেন ধুয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

হীরা বলল, এবারে আমি যাই।

রবিন বলল, দাঁড়া আগে আমি ঘুরে আসি। তারপর শার্টটা খুলে কাঁধে ফেলে গম্ভীর ভাবে হেঁটে গেল! নৌকাটার কাছে গিয়ে গেঞ্জিটাও খুলে ফেলল, তারপর সেগুলি একটা ঝোপের উপর রেখে আস্তে আস্তে নৌকার পাশ দিয়ে নদীর পানিতে নামতে লাগল। ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল গোসল করবে। নৌকাটার খুব কাছে ঘেঁষে দুটো ডুব দিয়ে উঠে ও খুব কায়দা করে গা হাত পা ডলতে লাগল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু আসলে নিশ্চয়ই ও কান খাড়া করে রেখেছে। হঠাৎ গা রগড়ানো বন্ধ করে কান খাড়া করে নৌকার দিকে ঝুঁকে পড়ল, নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু শুনতে

পেয়েছে। ঠিক সেই সময়ে একজন ডাকাতকে বের হতে দেখে ও বিপুল বেগে বুক ঘাড় রগড়ে রগড়ে ময়লা বের করতে লাগল, ঈশ্বরের কৃপায় সেটির ওর অভাব ছিল না। ডাকাতটি আবার ভিতরে ঢুকে গেল। আমার বুক ধুকধুক করছিল, আমি এদিক সেদিক তাকালাম। এমন সময় দেখি মাছ বাজারে দেখা সেই ঢিলেঢালা পুলিসটা হাতে এক কুড়ি কই মাছ নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি হীরাকে একটু টিপে দিয়ে গম্ভীর ভাবে একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে চিবুতে লাগলাম।

পুলিসটা আমাদের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। আমাদের খানিকক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

ঢাকা। কেন জানি আমার মনে হল এখন বোকার মত উত্তর দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এখানে কোথায় এসেছ?

চাচার বাড়ি।

চাচার বাড়ি কোথায়?

হীরা ফ্যাকাসে মুখে আমার দিকে তাকাল। আমি একবার ঢোক গিললাম। ইশ! এই এলাকার একটা গ্রামের নামও জানি না! থানাটার নামটা পর্যন্ত ভাল করে পড়ে আসলাম না।

কোথায় চাচার বাড়ি? পুলিসটা আরেকটু এগিয়ে এল। মনে হল খপ করে হাত ধরে ফেলবে! আমি সন্তর্পণে একটু পিছিয়ে এসে বললাম, পলাশপুর, নাজিরপুর থানায়।

সত্যি সত্যি নাজিরপুর থানায় পলাশপুর নামে একটা গ্রাম আছে, স্কুল থেকে একবার পিকনিকে গিয়েছিলাম। তবে সেটি বহুদূরে।

পুলিসটা একটু থতমত খেয়ে বলল, তা এখানে কি করছ?

চাচার সাথে এসেছি।

চাচা কই?

মাছ কিনতে গেছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন। ঐ তো আমাদের নৌকা— আমি একটা নৌকা দেখিয়ে দিলাম।

কতক্ষণ যে এভাবে একনাগাড়ে মিছে কথা বলতে হবে কে জানে। আর এই ব্যাটা পুলিস আমাদের পিছু লাগল কেন বুঝতে পারলাম না। সে এবারে হীরাকে ধরল। তোমার বাড়ি কোথায়?

হীরা কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম, ও আমার চাচাত ভাই। ওর আব্বার সাথেই আমরা টাউনে যাচ্ছি।

পুলিসটা একটু হতাশ হল মনে হল। তবু আমাকে জিজ্ঞেস করল, নাম কি তোমার?

খালেকুজ্জামান চৌধুরী। আমি রঞ্জুর নামটা বলে দিলাম!

তোমার?

শফিক আহমেদ। শফিক ভাইয়ের নামটা হীরা নিজের নাম বলে চালিয়ে দিল। পুলিসটা একটু কুটিল চোখে তাকাতেই হীরা বিবর্ণ হয়ে বলল, পুরো নাম শফিক আহমেদ চৌধুরী।

আব্বার নাম?

নাজির আহমেদ চৌধুরী। এবারে হীরা আর চৌধুরী বলতে ভুল করল না।

পুলিসটা আমাদের লক্ষ্য করতে করতে বলল, এদিকে তোমাদের বয়েসী কোন ছেলেপেলে দেখেছ? একজনের হাত কাটা, আরেকজনের হাত ভাঙা? মোট ছয়জন?

হীরার চোয়াল ঝুলে পড়ল আর আমার হৃদপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে উঠে ধুক-ধুক করতে লাগল। পুলিসটা তাহলে আমাদেরই খোঁজ করছে! জ্বর ছিল বলে চাদর গায়ে বেরিয়েছি প্লাস্টার করা হাতটা ঢাকা, নইলে কথাবার্তা না বলে ক্যাক করে ঘাড় আঁকড়ে ধরত। পুলিস তাহলে আমাদের সবাইকে খোঁজ করছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি খোঁজ পেল কেমন করে? আমি আন্দাজ করলাম, মিশুর আব্বা ডি. এস. পি., তিনিই হয়তো আশেপাশে সব থানাতে ফোন করে দিয়েছেন। আমি আড়চোখে হীরার দিকে তাকালাম হীরা আমার দিকে তাকাল। আমি একটু ঘুরে নদীতে গোসল করতে থাকা রবিনকে দেখতে গিয়ে থেমে গেলাম। পুলিসটাও যদি ওদিকে তাকায়? তাহলে বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না! এখন যদি রবিন গোসল শেষ করে কাটা হাতটা দুলিয়ে দুলিয়ে ফিরে আসে? কিংবা বাতাসে চাদরটা উঠে গিয়ে যদি প্লাস্টার করা আমার হাতটা বেরিয়ে পড়ে? আমি চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে হাত দুটো চাদরের তলাতেই ভাঁজ করে বুকের উপর রাখলাম। দেখতে এখন একটু চালিয়াৎ মনে হলেও কেউ সন্দেহ করবে না একটা হাত প্লাস্টার করা! তবুও আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল।

দেখেছো, না? পুলিসটা আমাদের এরকম হতভম্ব হতে দেখে উৎফুল্ল স্বরে জিজ্ঞেস করল। আমি ঢোক গিলে মাথা নাড়লাম।

কোথায় দেখেছ? কোন্ দিকে গেছে!

এই তো এদিকে। আমি থানার পাশে ডিস্ট্রিক বোর্ডের বড় সড়কটা দেখিয়ে দিলাম।

কখন গেছে? পুলিসটা একটু উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

এই তো এই মাত্র। পাঁচ মিনিটও হয়নি।

হীরা ঢোক গিলে বলল, একজনের বাম হাতটা কাটা।

আমি বললাম, না ডান হাতটা। যদিও খুব ভাল করে জানি রবিনের বাম হাতটাই কাটা।

ইশ! হীরা সত্যি সত্যি ক্ষেপে উঠে বলল, বাম হাত না? সেই যে—

ধেৎ! এই দিক দিয়ে গেল, ডান হাতটা কাটা। আরেকজনের হাতে প্লাস্টার-ওরও ডান হাত। আমি ডান হাতটা বের করে হীরার নাকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে

আনলাম।

পুলিসটা আমাদের ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে থানার দিকে হেঁটে গেল। আমি খুব সন্তর্পণে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নদীর দিকে তাকালাম। রবিন শার্ট পরে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে রবিন উত্তেজিত মুখে কি একটা বলতে যাচ্ছিল— হীরা মুখ খিঁচিয়ে উঠল আর আমি দাবড়ানি মেরে তাকে থামিয়ে দিলাম। আমার মুখে সব শুনে রবিনের চোখ কপালে উঠল, বলল, সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি নৌকায় চল।

নৌকায় যেতে যেতে রবিন বলল, ডাকাতেরা আজ রাতে শুভাপুরে ডাকাতি করবে।

সত্যি?

হ্যাঁ, ইদরিস খাঁর বাড়িতে।

স্পষ্ট শুনেছিস, নিজের কানে?

না, অন্যের কানে— বলে রবিন মুখ খিঁচিয়ে উঠল। কথা না বলে আমরা ছুটতে ছুটতে নৌকায় এসে উঠলাম।

নৌকায় পৌঁছে দেখি রান্নাবান্না শেষ। মিশু বাজারে গেছে আমাদের খুঁজে আনতে। সলিল আর টিপু আমাদের খুব একচোট গালি দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমাদের মুখে সব শুনে ফ্যাকাসে মেরে গেল। সলিল শুধু বলল, সর্বনাশ! মিশুকে যে এ এলাকার সব পুলিস চেনে, ওদের বাসাতে প্রায়ই যায়!

মিশুর জন্যে চিন্তায় পড়ে গেলাম। টিপু খুব সাবধানে নদীর তীর দিয়ে মিশুকে খুঁজতে গেল। একটু পরে ছুটতে ছুটতে হাজির হল। লাফিয়ে নৌকায় উঠে বলল, নৌকা ছাড়ো! মিশুকে পুলিস ধরেছে—

ভাঁটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত বৈঠা ফেলে নৌকা নিয়ে আমরা সামনে অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে তীরের দিকে তাকালাম। একজায়গায় খুব ভিড়। নিশ্চয়ই মিশুকে যেখানে ধরা হয়েছে সেখানেই ভিড়টা। আহা বেচারা! ওকে দেখামাত্র নিশ্চয়ই চিনে ফেলেছিল, মিথ্যে কথা বলার সুযোগও পায়নি। ওর চিন্তা নেই অবিশ্যি— আরামে বাসায় পৌঁছে যাবে, বাসায় একটু আধটু পিটুনি খেতে পারে, (সে তো আমরাও খাব) কিন্তু ডাকাত ধরার আনন্দ তো আর পেল না।

রবিন গলা বের করে আরেকটা নৌকাকে জিজ্ঞেস করল, শুভাপুর কোন দিকে?

নৌকার মাঝি আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই দেখিয়ে দিল। আমরা দ্রুত নৌকা বাইতে লাগলাম। একটু পরেই অনেক পুলিস আমাদের খুঁজতে বের হবে— তার আগেই পালিয়ে যেতে হবে।

আমরা অনেকক্ষণ কোন কথাবার্তা বললাম না! অ্যাডভেঞ্চারে বের হবার পর যদি কাউকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায় বাসাতে ফেরত পাঠাবে বলে তাহলে অন্যদের কি সাংঘাতিক মন খারাপ হয়ে যায় বুঝিয়ে বলতে হয় না। আমাদের সবারই মনে হচ্ছিল এসব ছেড়েছুঁড়ে বাসায় চলে যাই, নান্টু, কাসেম নেই মিশুও ধরা পড়ে গেল বাকি আমরা কজন থেকে আর কি করি?

কোন কথা না বলে আমরা মুখ গুঁজে দাঁড় টানতে লাগলাম। ডাকাতের নৌকাটাকে সেখানে ফেলে রেখে আমরা বহু এগিয়ে এসেছি। দুটি মস্তো বাঁক এর মাঝে পার হয়ে গেছে। পিছনে দেখতে দেখতে টিপু এক সময়ে বলল, ডাকাতদের নৌকাটা একটু পরেই এসে পড়বে।

কেন?

পুলিস তো আমাদের খুঁজতে বের হয়ে গেছে, কাজেই ডাকাতেরা ওর মাঝে থাকতে চাইবে না। নৌকায় খোঁজ করে যদি ডাকাতদের বন্দুক বের হয়ে পড়ে?

ঠিকই বলেছিস। রবিন মাথা নাড়ল। টেলিস্কোপ দিয়ে পিছনে তাকাতে তাকাতে বলল, আমরা আগে আগেই শুভাপুরে পৌঁছে নৌকা থামিয়ে রাখব। তাহলে ডাকাতেরা সন্দেহ করবে না।

আমি বললাম, এমনিতেও আমাদের সন্দেহ করবে না! কোন ডাকাত কি চিন্তা করতে পারবে আমরা একমাস ধরে ওদের পিছু ঘুরছি?

তা অবিশ্যি ঠিক। সলিল একটু দুঃখ দুঃখ স্বরে হঠাৎ বলল, আহা, বেচারা মিশু!

আমাদেরও দুঃখ হচ্ছিল, কিন্তু করার কিছু নেই। আর যাই করি না কেন থানা থেকে তো আর ওকে ছিনিয়ে আনতে পারি না।

এক সময় হীরা বৈঠাটাকে নামিয়ে রেখে মুখ হাঁ করে দম নিতে লাগল। বেচারা অনেকক্ষণ একটানা বৈঠা বেয়েছে। সলিল কথা না বলে হীরার জায়গায় বৈঠা নিয়ে বসল! রবিন আনমনে এক হাতে দাঁড় টানছিল, টিপু নৌকার মাঝে লম্বা হয়ে শুয়ে শুয়ে কি ভাবছে। পাশ দিয়ে মস্তো বড় একটা মহাজনী নৌকা ভেসে গেল। একটু দূরে একটা জেলে নৌকা জাল গুটিয়ে তুলছে। কালো জালে চকচকে কি একটা মাছ খলবল করে উঠল।

তুই ডাকাতদের নৌকায় কি কি শুনলি আবার বল তো। হীরা রবিনের কাছে সরে আসে, তখন ঝামেলার মাঝে ঠিক শুনতে পারিনি।

হ্যাঁ হ্যাঁ বল— টিপু উঠে বসে এগিয়ে আসে, তুমি কি স্পষ্ট শুনেছ ওরা শুভাপুর গ্রামে যাবে?

রবিন মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ আমি স্পষ্ট শুনেছি। ওরা কয়েকজন বলছিল শুভাপুর গ্রামের ইদরিস খাঁর বাড়ি, অন্যেরা বলছিল মেথিকান্দা গ্রামের বিলায়েৎ উদ্দিন না কি

যেন লোকের বাড়ি।

তুই এত সব মনে রাখলি কেমন করে?

মনে নেই তো।

মানে?

শুধু শুভাপুর আর ইদরিস খাঁর নাম মনে আছে। অন্যগুলি বানিয়ে বললাম।

বাঃ! আমি ঠাট্টা করে বললাম, ও দুটোও বানিয়ে বললি না কেন?

খ্যাকখ্যাক করিস না— রবিন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে, ওরা তো যাবে শুভপুরে, ইদরিস খাঁর বাড়িতে! এ দুটো মনে রাখলেই তো হল, অন্যগুলি না মনে না রাখলে ক্ষতি কি?

কোন ক্ষতি নেই। টিপু সায় দিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, কিন্তু এ দুটো ঠিক শুনেছ তো?

রবিন আবার ক্ষেপে উঠল, একশবার বললাম স্পষ্ট নিজের কানে শুনেছি চাঁদ ডুবে যাবার পর শুভাপুরে ইদরিস খাঁর বাড়িতে ওরা ডাকাতি করবে, তা কেউ বিশ্বাস করবে না!

আচ্ছা বাবা আচ্ছা! বিশ্বাস করলাম। সলিল বৈঠা দিয়ে পানিতে একটা হ্যাঁচকা টান মারে, নৌকাটা একটু দুলে উঠে সবাইকে শান্ত করে দেয়।

টিপু বলল, এখন তাহলে ভেবে ভেবে একটা প্ল্যান বের করো, কিভাবে কি করা যায়।

প্ল্যানের কথা মনে হতেই সবাই নড়েচড়ে ভাবতে বসল, আর প্রায় একই সাথে সবারই মনে হল এখনও খাওয়া হয়নি, ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমরা প্ল্যানের কথা তুলে রেখে খেতে বসে গেলাম, একেকবারে দুজন করে। নৌকা থামানো উচিত হবে না আমরা ডাকাতের নৌকার আগে পৌঁছুতে চাই।

রান্না ভালই হয়েছে তবে একটু শুকনো শুকনো লাগছিল। ডিমভাজা গুলি কাঁচা কাঁচা রয়ে গিয়েছিল, অবিশ্যি খেতে খারাপ লাগেনি। ডালটা প্রায় বাসায় রাঁধা ডালের মত হয়েছিল। আমরা খেয়ে ঢেকুর তুলে পালা করে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। তরতর করে নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে। বসে থেকে বারকতক টেলিস্কোপ দিয়ে ডাকাতের নৌকাটা খুঁজে দেখলাম পাওয়া গেল না। রওনা দিয়ে থাকলেও নিশ্চয়ই কোন না কোন বাঁকের আড়ালে পড়ে আছে।

আমি বললাম, শুভাপুর পার হয়ে আসিনি তো? একটু খোঁজ নিলে হতো ওটা আর কতদূর।

দাঁড়া জেনে নিচ্ছি, বলে রবিন আশেপাশে তাকাল। কাছাকাছি কোন নৌকা নেই। রবিন নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে তীর দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা লোককে জিজ্ঞেস করল, হেই চাচা! শুভাপুর কতদূর?

উত্তর আসলো, আরো ছয়সাত খান বাঁক।

টিপু বুদ্ধি করে জিজ্ঞেস করল, বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছা যাবে?

লোকটা সূর্যটাকে একনজর দেখে বলল, যাতি পারে।

আমরা লোকটাকে পাল্টা প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে নৌকাটাকে দ্রুত মাঝ নদীতে নিয়ে এলাম। ভাঁটার প্রবল টানে নৌকা যেন উড়ে চলল।

টিপু বলল, যদি সন্ধ্যার দিকে আমরা শুভাপুর পৌঁছাই তাহলে হাতে সময় থাকবে প্রায় ছয়ঘন্টা।

কিভাবে?

রাত বারটার দিকে চাঁদ ডুববে। গতকালও তাই ডুবেছিল, তাই না সলিল?

হুঁ। শুক্লপক্ষ চলছে। গতকাল ষষ্ঠী ছিল।

কি বলল সেই বুঝল, আমি মাথা ঘামালাম না। বললাম, এই ছ'ঘন্টা আমরা কি করব?

একটা দল যাবে কাছাকাছি থানাতে পুলিসকে খবর দিতে। আরেকটা দল যাবে ডাকাতদের পিছু পিছু দরকার হলে ডাকাতদের আটকাবার জন্যে।

ইয়েস! রবিন বুকে টোকা মারল। সেটার লীডার আমি!

ইহ্! হীরা মুখ বাঁকায়, দেখা যাবে।

কে কে থানাতে যাবে?

আমি না। আমি আগেই হাত তুলে না করলাম।

আমি তো লীডার, যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রবিন হাতড়ে হাতড়ে রিভলবারটা বের করে।

হীরা বলল, পুলিস দেখলে আমার ভয় করে।

সলিল বলল, আমার মোটেই ভয় করে না, কিন্তু তাই বলে মনে করিস না আমি যাব।

টিপু বলল, তাহলে? তাহলে কেউ থানাতে যাবে না?

দেখা গেল সত্যি কেউ থানাতে খবর পৌঁছে দিতে রাজি না। সবাই ডাকাতদের সাথে সাথে থাকতে চায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হল লটারি করা হবে। লটারি থেকে আমি আর রবিন বাদ পড়লাম, কারণ নৌকা নিয়ে থানায় যেতে হলে আমরা দুজন একেবারে অসহায়, দুজনেরই একটি করে হাত! আমি অবিশ্যি একবারও মনে করিয়ে দিলাম না হাঁটা পথেও থানাতে যাওয়ার পথ থাকা সম্ভব, তাহলে লটারির ঝুঁকিটুকু নিতে হয়!

টিপু কাগজ ছিঁড়ে তাদের তিনজনের নাম লিখল। ঠিক হল যে দুজনের নাম উঠবে তারা থানাতে যাবে, বাকি জন আমাদের সাথে থাকবে।

আমি লটারি করলাম। টিপুর ভাগ্যে আমাদের সাথে থাকার সৌভাগ্য হল, হীরা আর সলিলের ভাগ্যে উঠল থানায় যাওয়া।

হীরা মুখ গোমড়া করে বসে থাকল, কিন্তু তাতে লাভ কি? লটারি হচ্ছে লটারিই! তার সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হয়।

ইসমাইল খাঁ

বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আমরা পিছনে ডাকাতের নৌকাটা দেখতে পেলাম। ওরা অনেক পিছনে, টেলিস্কোপে অনেক কষ্ট করে আবছা মত দেখা যায় তবে খুব তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে। সবগুলি ডাকাতই খুব দারুণ নৌকা বাইতে পারে। আর একেকটার স্বাস্থ্য কি!

একটু পরেই সন্ধে হয়ে আসবে, আমরা জোরে জোরে হাত চালালাম। শুভাপুর আর বেশি দূরে নয়, বামদিকে বিষখালি নদীর মুখ, ওদিক দিয়ে মাইলখানেক যেতে হবে। বিষখালির মুখে এসে দেখি ভাঁটার টানে পানি হড় হড় করে বের হচ্ছে। সে কী স্রোত! এই স্রোত ঠেলে যাওয়া আমাদের কর্ম নয়। আমরা সেখানেই নৌকা বেঁধে ফেললাম, বেশি দরকার হলে একমাইল হেঁটেই চলে যাব।

টিপু হাঁড়িতে পানি গরম করে চা, চিনি বের করতে লাগল। ওর নাকি বিকালে চা না খেলে বিকালটা কাটতেই চায় না! চা তৈরি করতে করতে ডাকাতের নৌকাটা এসে পড়ল, থামল আমাদের কাছ থেকে অল্প দূরে। সেখানেই লগি পুঁতে তার সাথে বেঁধে ফেলল। আমরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলাম, ভাগ্য ভাল থাকলে এরকমই হয়। রবিন আর আমি ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়লাম, আমাদের দেখলে চিনে ফেলতে পারে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে তখন আর কোন ভয় থাকবে না। ডাকাতেরা ভাত রাঁধার আয়োজন করতে লাগল, আমাদের আশে-পাশে থেমে থাকা নৌকাগুলিও দেখি ভাত চড়িয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আমাদের আর ভাত রাঁধার উৎসাহ ছিল না। টিপু বুদ্ধি দিল চিড়ে আর কলা কিনে আনতে। হীরা টিপু আর আমি চাদর মুড়ি দিয়ে ভাল করে ঢেকেঢুকে চিড়ে কলা কিনতে গেলাম। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে শুভাপুরের রাস্তা, ইদরিস খাঁর বাড়ি, কাছাকাছি থানায় যাবার সোজা পথ এসব জেনে আসব।

যাবার সময় রবিন আর সলিলকে আমরা নানাভাবে সাবধান করে এসেছি। ভীষণ শীত পড়েছে তার মাঝে গুটিশুটি মেরে আমরা চাদর জড়িয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মনে হল গত পরশুদিনও জ্বরে বিছানায় শুয়ে ছিলাম! ভাগ্যিস আর জ্বর আসেনি।

বহুদূরে ছোট্ট একটা দোকান পাওয়া গেল। সন্ধ্যে হতে না হতেই ঝাঁপ ফেলে বন্ধ করার আয়োজন করছে। আমরা চিড়ে কলা আর গুড় কিনলাম। আসার সময় ইদরিস খাঁর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতেই দোকানদার একটু অবাক হয়ে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, ক্যান?

একটু দরকার ছিল।

এখানে তো ইদরিস খাঁ বলে কেউ নেই।

কেউ নেই? আমরা হতবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। আবার জিজ্ঞেস করলাম, কেউ নেই?

ইসমাইল খাঁ আছে। খানবাড়ির।

সেই হবে, টিপু মাথা নাড়ে। আমাদের ভুল হয়ে গেছে।

ইসমাইল খাঁর বাড়িটাই কদ্দুর?

এখান থেকে আধক্রোশ, দক্ষিণে।

একটু ভাল করে চিনিয়ে দেন না, আমরা যাব।

দোকানদার আমাদের বুঝিয়ে দিল। কাঁচা সড়কটা ধরে এক মাইল গেলে একটা মসজিদ পাওয়া যাবে, শায়েস্তা খাঁর আমলের, সেটার বাম পাশে বাঁশের সাঁকো। ওটা পার হয়ে ছোট সড়কটা ধরে খালের পাশেপাশে গেলে বড় যে টিনের বাড়িটা চোখে পড়বে, সামনে বড় দিঘি, সেটাই ইসমাইল খাঁর বাড়ি। ধানের গোলা আছে আর সামনে বড় বড় পাঁচ ছয়টা খড়ের পালা।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলাম, কাছাকাছি কোথায় থানা আছে বলতে পারেন?

দোকানদার একটু অবাক হয়ে এদিক সেদিক তাকাল তারপর বলল, থানা দিয়ে কি হবে?

কাজ ছিল, বলে টিপু খুব অন্তরঙ্গ সুরে আবার থানার কথা জিজ্ঞেস করল।

জানা গেল শুভাপুর গ্রামটা দুটি থানার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। দুটি থানাই নৌকায় দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টার পথ। তবে মিশু যেখানে আটকা আছে সেটি তুলনামূলক ভাবে কাছে। হেঁটেও যাওয়া যায়। ঠিক ঠিক শর্টকাট গলি ধরতে পারলে নাকি ঘন্টা দেড়েকেও পৌঁছা যায়।

আমরা সব খবরাখবর নিয়ে আবার গুটিগুটি ফিরে এলাম। ফিরে আসার সময় দোকানদার কোথা থেকে এসেছি কোথায় যাব এইসব জিজ্ঞেস করছিল। আমরা না শোনার ভান করে পা চালিয়ে চলে এসেছি। আমার মনে হল ব্যাপারটা ভাল হল না, কিন্তু এছাড়া উপায়ও ছিল না।

নৌকায় এসে দেখি সলিল টেলিস্কোপটা হাতে নিয়ে ঝিমুচ্ছে। আমাদের দেখে ধড়মড় করে জেগে উঠল, অ্যাঁ তোরা? এতক্ষণে এসেছিস?

হুঁ। রবিন কই?

রবিন? সলিল বোকার মত এদিক সেদিক তাকায়। এই তো, এখানেই ছিল!

কই গেল? আমরাও এদিক-সেদিক খুঁজলাম, চাপা স্বরে ডাকলাম, রবিন! রবিন!!

এখন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করা যায়! চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, ভাঙা চাঁদটা মিছেই অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করছে। এক্ষুনি থানাতে রওনা

দিয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু রবিনকে না পেলে সেটি করাও যাচ্ছে না। হম্বিতম্বি করে নিজেকে সর্দার বলে দাবি করে সত্যি কিন্তু ওকে ছাড়া কাজও চালানো যায় না।

প্রায় পনেরো মিনিট পর রবিন হঠাৎ পানি থেকে ভুস্ করে ভেসে উঠল। মাথায় কচুরিপানা লেগে আছে, শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে। আমরা ওকে টেনে নৌকায় তুললাম।

কি করছিলি? পানিতে নেমেছিলি ক্যান?

বলছি। রবিন হি হি করে কাঁপতে থাকে। কাপড় বদলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে উত্তেজিত রবিন হড়বড় করে বলল, ও অন্ধকারে ডাকাতের নৌকার পাশে ঘুপচি মেরে ভেসেছিল, মাথা কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে। ওদের পরিকল্পনা খুঁটিনাটি শুনে এসেছে। আমরা মহা উত্তেজিত হয়ে রবিনকে খামচাখামচি শুরু করলাম, তোর দারুণ সাহস তো!

সাংঘাতিক!

এই শীতের মাঝে গেলি কেমন করে?

ভয় করল না?

রবিন বুকের মাঝে টোকা দিয়ে বলল, ইয়ে হায় রবিন কা বাচ্চা রবিন!

আমরা ডাকাতদের পুরো পরিকল্পনাটা রবিনের মুখে শুনলাম। রবিন বলল, যে বাড়িতে ডাকাতি করবে তার নাম ইসমাইল খাঁ— ইদরিস খাঁ নয়।

আমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকালাম। টিপু বলল, ইদরিস খাঁ বলে আসলে কেউ নেইও। খোঁজ নিয়ে এসেছি।

ডাকাতেরা চাঁদ ডুবে যাওয়ার ঠিক পরে পরে রওনা দেবে। ইসমাইল খাঁর বাড়িতে করিমন নামের একটা মেয়ে লোক থাকে, সে দরজা খুলে রাখবে। ওরা ভিতরে ঢুকবে ছয়জন, বাইরে পাহারা থাকবে ছয়জন। দুজন দিঘির পাড়ে অন্যেরা বাড়ির আশেপাশে। ডাকাতি করার সময়ে প্রথমে ফাঁকা গুলি করবে আর চেঁচামেচি করে এদিকে সেদিকে আগুন লাগিয়ে দেবে। লোকজনকে বেঁধে ফেলবে, ঘরে বন্ধ করে রাখবে, দরকার হলে মারধর করবে।

সলিল একটু শিউরে উঠল।

যারা ভিতরে ঢুকবে তারা ইসমাইল খাঁ আর তার ছেলেদের বেঁধে ফেলবে, তারপর ভীষণ মার দিতে থাকবে যতক্ষণ না সিন্দুকের চাবি দিয়ে দেয়। গতকাল বিক্রি করা ধানের সতের হাজার টাকা, ইসমাইল খাঁ আর তার ছেলেদের বৌয়ের বিশত্রিশ ভরি সোনার গয়না, ইসমাইল খাঁর দোনালা বন্দুকটা, আর মূল্যবান জিনিসপত্র যা আছে সব নিয়ে ওরা বের হবে।

সর্বনাশ! তারপর?

যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে ওরা ইসমাইল খাঁয়ের চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে ঢুকবে, একই ভাবে। তারপর পাশের বাড়ি, তারপর তার পাশেরটা এভাবে

যতক্ষণ পারা যায়।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে রবিন একটু দম নিল। আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতাম কিন্তু পানির ভিতরে কি একটা পায়ের উপর দিয়ে সাঁৎ করে চলে গেল। নড়ে উঠতেই একটু শব্দ হয়ে গেল, সাথে সাথে ডাকাতেরা সবাই চুপ করে গেল। সর্দারটা একজনকে বলল বাইরে কি শব্দ করছে দেখতে।

সর্বনাশ! তারপর?

আমি সাথে সাথে ডুব সাঁতার দিয়ে একেবারে এইখানে।

টিপু বলল, আর কিছু শোনোনি? কতজন লোক কি সমাচার?

রবিন অধৈর্য হয়ে মাথা ঝাঁকালো, ওরা কি আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পরামর্শ করছে! গুজগুজ করে কথা বলে আর কি বিশ্রী ভাষা! ভীষণ তর্ক করছিল তাই এক কথা বারবার বলছিল। তাতেই কিছু কিছু বোঝা গেল।

ওদের কটা বন্দুক?

তিন চারটা হবে। অন্যেরা বর্শা দা এসব নিয়ে যাবে।-রিভলবারটা হারিয়েছে বলে চান্দু নামে একটা ডাকাতকে সবাই বিশ্রী করে একটু পরে পরে গালি দিচ্ছে।

ওরা কি কাউকে মেরে টেরে ফেলতে পারে?

দরকার না পড়লে ওরা কাউকে খুন করবে না বলেছে! কিন্তু দরকার হয়তো পড়তে পারে। ইসমাইল খাঁ নাকি খুব শক্ত মানুষ।

ডাকাতদের পিছে পিছে রওনা দেয়ার সময় আমরা যেসব হালকা অ্যাডভেঞ্চারের কথা ভেবে রেখেছিলাম, ঘটনার ঠিক সামনাসামনি এসে সেসব কর্পূরের মত উবে গেছে। সবার ভিতরে আতঙ্ক ঢুকে গেছে, রবিন পর্যন্ত কোন কথা না বলে রিভলবারটা নাড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ পর টিপু বলল, আমাদের এখনই থানায় খবর পাঠানো উচিত।

সলিল বলল, অবস্থা যে রকম তাতে মনে হচ্ছে আমরা নিজেরা কিছু করতে পারব না।

রবিন চোখ পাকিয়ে সলিলের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

চিড়ে গুলো কলা দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে আমরা বেশি করে পানি খেয়ে নিলাম। রবিন গুলি ভরে রিভলবারটা কোমরে বেঁধে নিল, অন্যেরা চাকু টর্চ দড়ি এইসব নিয়ে যুদ্ধ সাজে সেজে নিলাম। তারপর গায়ে চাদর জড়িয়ে নৌকা ছেড়ে তীরে উঠে আমরা হাঁটতে লাগলাম। সলিল আর হীরাকে থানার রাস্তায় উঠিয়ে দিয়ে আমরা গোপনে ইসমাইল খাঁর বাড়ি যাব।

একটু পরেই রাস্তার দুপাশে ঘন জঙ্গল শুরু হয়ে গেল। আমরা তার মাঝে দ্রুত হেঁটে চলেছি। হঠাৎ পিছনে ভীষণ একটা গলার আওয়াজ শোনা গেল, কারা যায়?

দাঁড়াও!

ঝট্ করে কোমরে হাত দিয়ে রবিন ঘুরে দাঁড়াল, সাথে সাথে আমরাও। দুজন লোক এগিয়ে আসছে। টিপু টর্চ জ্বাললো, একজন সেই দোকানদার, আরেকজনকে চিনি না।

লোকটি বয়স্ক, লম্বা চওড়া, পাকা দাড়ি, অভিজাত চেহারা। দোকানদার আমাদের দেখিয়ে বলল, এই যে হুজুর, এরা।

পাকা দাড়িওয়ালা লোকটা আমাদের একনজর দেখল তারপর কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছ?

রবিন উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

লোকটি ক্ষেপে গেল মনে হল। এগিয়ে এসে আরো কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে এসেছ তোমরা? কি চাও?

আমার মনে হচ্ছিল এ লোকটিই ইসমাইল খাঁ। একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, আপনার নাম কি ইসমাইল খাঁ?

লোকটি ঘুরে আমার দিকে তাকাল। বলল, হ্যাঁ।

রবিন হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর ক্লান্ত স্বরে বলল, আপনাকেই আমাদের দরকার। আমাদের আপনার বাড়ি নিয়ে চলুন। তাড়াতাড়ি—

টিপু বলল, থানাতে এক্ষুনি একটা লোক পাঠাতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যেন পৌঁছে যায়।

ইসমাইল খাঁ একটু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, কি বলছ তোমরা? আমি কিছু বুঝতে পারছি না!

সব বুঝিয়ে দেব। রবিনের গলায় আবার কর্তৃত্বের স্বর ফুটে ওঠে, তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন, দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সবাই মিলে আমরা ইসমাইল খাঁর বাড়িতে ছুটলাম।

নারকীয় রাত

সে ভারি দুঃখের ব্যাপার, আমরা এতো কষ্ট করে ডাকাতদের হদিস জোগাড় করে আনলাম কিন্তু ডাকাতদের বাধা দেয়ার সব পরিকল্পনা করা হল আমাদের কোন কথা না শুনেই। এমনকি ইসমাইল খাঁ একবার আমাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন! রবিন অসহায় রাগে বসে বসে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে আমাদের দিকে তাকাল।

সলিলকে ইসমাইল খাঁর ছোট ছেলের সাথে থানায় পাঠান হল। সলিল অবিশ্যি যেতে চাচ্ছিল না এখানকার মজাটাই সে দেখতে চায়, কিন্তু ওকে বোঝানো হল সে ফিরে এসেও মজা দেখতে পারবে।

ইসমাইল খাঁ চুপিচুপি কি আয়োজন করলেন আমরা জানতে পারলাম না। প্রচুর লোক জোগাড় করা হচ্ছে, গোপনে আরো দুটি বন্দুক আনা হয়েছে আর করিমন নামের মেয়ে লোকটিকে আটকে ফেলা হয়েছে এটুকুই শুধু টের পেলাম। কিন্তু ঠিক কিভাবে ডাকাতগুলিকে ধরা হবে, কিংবা ধরা হবেও কিনা, কিছুই জানতে পারলাম না। আমাদের যখন কোন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল না তখন ভীষণ খারাপ লাগছিল। রবিন একবার একটা বুদ্ধি বাতলে দিতে গেলে ইসমাইল খাঁ মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, তোমরা ছেলে ছোকরারা এর মাঝে কেন?

রবিন চোখ মুখ লাল করে ফেরত আসল। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে এক সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, চল পালাই।

কোথায়?

বাইরে, এদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক আসল সময়টাতেই আমাদের বের হতে দেবে না!

ঠিক বলেছিস! বলে আমরা খুব অন্যমনস্ক ভঙ্গি করে চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে এলাম। এতো উত্তেজনা এবং ব্যস্ততার মাঝে আমাদের কেউ খেয়াল করল না।

বাড়ি থেকে বেশ অনেকটা দূরে একটি বড় পেয়ারা গাছ পাওয়া গেল। আমরা চুপিচুপি সেটাতে উঠে বসলাম। আমি ভাঙা হাত নিয়ে কিছুতেই উঠতে পারছিলাম না, অন্যেরা টেনে তুললো। অনেক উপরে বেশ আরাম করে বসে রবিন বলল, এই জন্যে আমরা নিজেরা ফাইট দিতে চাচ্ছিলাম! দেখলি? আমাদের কেউ পাত্তা দিচ্ছে না?

ওদের দোষ কি। দেখেছে বয়েস কম।

বয়েস কম? বয়েসই কি সব? আমাদের কি ইয়ে কম আছে নাকি?

কিয়ে?

বুদ্ধি, সাহস, অস্ত্রশস্ত্র, কায়দা? আমরাই সব করলাম, অথচ অথচ —

আমরা চুপ করে থাকলাম। রবিন গজগজ করতে লাগল, ওর দুঃখ পাবার ন্যায্য কারণ আছে।

খানিকক্ষণ পরে দেখি ইসমাইল খাঁর লোকজন আমাদের খোঁজ করছে। নাম জানে না তাই খোকারা, খোকাসকল বলে ডাকছে। আমরা হাসি চেপে চুপচাপ গাছের ডালে বসে রইলাম। হীরা ফিসফিস করে বলল, খোঁজ ব্যাটারা খোঁজ!

যখন খুঁজে পেল না তখন শুনলাম বলাবলি করছে, রাগ করেছে নাকি? কেউ নজর দিচ্ছিল না। না খেয়ে আছে নাকি কে জানে!

ধাপ্পা দিল না তো?

আজকালকার ছেলে ছোকরা।

হয়তো মজা করার জন্যে –

তবু সাবধান থাকা ভাল। বলা তো যায় না!

না মজা করেনি— ওদের একজন থানায় গেল না?

তা বটে। কিন্তু অন্যেরা গেল কই?

আমরা গাছে বসে খিকখিক করে হাসতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ হল আমরা গাছে বসে আছি। আকাশে ভাঙা একটা চাঁদ, একটা নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে — ডুবতে দেরি নেই। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস, অল্প অল্প হিম পড়ে মাথা ভিজে যাচ্ছে। কি একটা পাখি ক্যাকক্যাক করতে করতে উড়ে গেল।

এক সময়ে ইসমাইল খাঁর বাড়ির সব আলো নিভে গেল। চুপচাপ সুনসান করছে। বাইরে থেকে দেখে কে বুঝবে ভিতরে ভিতরে বাড়িটার চারিপাশে শক্ত পাহারা, লাঠি, সড়কি বন্দুক নিয়ে শখানেক লোক লুকিয়ে অপেক্ষা করছে।

বসে থাকতে থাকতে তন্দ্রামত এসে গেল, মনে হচ্ছে কয়েক যুগ বসে আছি। হঠাৎ রবিন খোঁচা মারল, আমি চমকে উঠলাম। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল দূরে ছায়ার মত কারা যেন চুপিচুপি গুড়ি মেরে আসছে। আমার দম বন্ধ হয়ে এল, বুকের ভিতর স্পষ্ট শুনতে পেলাম টিপটিপ টিপটিপ শব্দ। টিপু আমার কাঁধ খুব শক্ত করে খামচে ধরল। লোকগুলি ঠিক পেয়ারা গাছটার নিচে দিয়ে চুপিচুপি হেঁটে গেল ইসমাইল খাঁর বাড়ির দিকে। অন্ধকার তাই চেহারা ছবি দেখা যায় না, শুধু বন্দুকের নল আর লম্বা লম্বা লাঠি সড়কির মাথাগুলি আবছা দেখা যাচ্ছিল। লোকগুলি ভিতরে উঠনে ঢুকতেই রবিন নড়েচড়ে উঠল, ফিসফিস করে বলল, চল নামি।

মানে?

ভিতরে গিয়ে দেখি।

কি সর্বনাশ! এখন মারামারি হবে।

দেখবি না?

ভীতু বলে প্রমাণিত হতে হয় তাই চুপিচুপি সরসর করে গাছ থেকে নামতে লাগলাম। আমি তখনো নামিনি, প্লাস্টার করা হাতটা নিয়ে একটু বেকায়দায় পড়েছি। অমনি হঠাৎ ক্রমাগত গুলির শব্দ হল। সঁ্যাৎ সঁ্যাৎ করে চারদিকে মশাল জ্বলে উঠল হৈ চৈ শব্দে শখানেক লোক ডাকাত গুলোকে ঘিরে ফেলল।

আমি গাছ থেকে লাফ দিলাম। ভিতরে তখন ভীষণ হৈ চৈ মার মার শব্দ। গুম গুম করে গুলি হচ্ছে — দু একটা আর্তনাদ শুনলাম। কোথাও আগুন লেগে গেছে, চড় চড় শব্দ হচ্ছে, ভীষণ আলো হয়ে সবকিছুর লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে। ঠাশ ঠাশ করে লাঠির শব্দ হতে থাকল, কে একজন গুলির মত আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

আমরা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। রবিন দৌড় দিয়ে ভিতরে যেতে গিয়ে একটা বাঁশের সাথে পা বেঁধে ভীষণ জোরে আছাড় খেল, ভাগ্যিস হাতের রিভলবারে ট্রিগারে

চাপ পড়ে গুলিটুলি বের হয়ে যায়নি। আমরা কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, বাঁশটা ডাকাতদের কীর্তি। কেউ পিছু নিতে গেলে পা বেঁধে আছাড় খেয়ে পড়বে! আমরা বাঁশটা খুলে নিলাম ঠিক এমন সময় দেখা গেল ভিতর থেকে কে একজন গুম গুম করে গুলি করে ছুটে আসছে। পিছনে পিছনে অনেক লোক। মশালের আলোতে দেখলাম বাম হাত কাটা সেই ভয়াবহ ডাকাত সর্দার! সর্দারটা ওখানে দাঁড়িয়ে আবার লোকজনের দিকে নির্মম ভাবে গুলি করল, সবাই হুটোপুটি করতে করতে ভিতরে সরে গেল। তারপর কাটা হাতে বন্দুকটা বুকের সাথে চেপে ধরে কিভাবে জানি খুলে গুলি ভরে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

আমরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি, সর্দারটি আমাদের দেখেনি। বুঝতে পারছি পাশ দিয়ে ছুটে যাবে। আমার মাথায় কি ভর করল জানি না ডাকাতটি ছুটে ঠিক আমাদের পাশে আসতেই হাতের লম্বা বাঁশটি তার পায়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম।

হঠাৎ বাঁশে পা লেগে ডাকাত সর্দার তাল হারিয়ে দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। বাঁশের ধাক্কায় আমি টিপুকে নিয়ে ছিটকে পড়লাম অন্য পাশে। টিপুর হাতের টর্চলাইট আমার কপালে ঠুকে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে জ্বলে উঠল। আমি তুলে নিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ডাকাতটির মুখে ধরলাম। কিছু না বুঝেই।

রবিন রিভলবারটা সোজা ডাকাত সর্দারের বুকের দিকে তাক করে ধরে বলল, একটু নড়বে কি গুলি করে দেব।

ডাকাত সর্দারের চোখ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। কাটা হাতটায় ভর দিয়ে সে আস্তে আস্তে উঠে বসল। তারপর খুব ধীরে ধীরে ডান হাতে ধরে থাকা বন্দুকটি রবিনের দিকে ঘুরিয়ে আনতে লাগল।

খবরদার! রবিন হিস হিস করে চেঁচিয়ে উঠল!

খবরদার, নড়বে না— গুলি করে দেব! ডাকাতটির মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, তবু সে আস্তে আস্তে বন্দুকটি ঘুরিয়ে আনতে লাগল।

খবরদার! রবিন পাগলের মত চিৎকার করে উঠল তবু গুলি করল না।

আমি শিউরে উঠে বুঝতে পারলাম রবিন যতই চেঁচামেচি করুক আসলে সে গুলি করতে পারবে না। একটা মানুষকে সামনাসামনি গুলি করতে মন যতটুকু শক্ত হওয়া দরকার রবিনের মন ততটুকু শক্ত নয়। ডাকাতটি এতক্ষণে বন্দুক ঘুরিয়ে এনে রবিনকে তাক করেছে, মুখে মনে হল একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। পিছন থেকে অনেক লোক ছুটে আসছে, কিন্তু লাভ কি? সামনাসামনি দুজন দুজনকে তাক করে আছে। কে আগে গুলি করে— কে আগে গুলি করে— কে আগে…

আমি চোখ বুজে একটা চিৎকার করে উঠলাম সাথে সাথে একসাথে অনেকগুলি গুলির আওয়াজ হল। চিৎকার আর্তনাদ, চেঁচামেচি, বারুদের গন্ধে পরিবেশটা নারকীয় হয়ে উঠল। আমি মুখ ঢেকে বসে পড়লাম কে গুলি খেয়েছে দেখার সাহস নেই। রবিন না ডাকাত সর্দার? রবিন না ডাকাত সর্দার? রবিন না—

এমন সময় বহুদূরে রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল, পরপর অনেকগুলি। পুলিশ আসছে। ইসমাইল খাঁর গলার আওয়াজ শুনলাম, ছেলেগুলির কিছু হয়নি তো?

না। কে একজন বলল, শুধু হাত কাটা ছেলেটা —

হাত কাটা ছেলেটা? আমার হৃদপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে এসে প্রচণ্ড শব্দে ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল।

শুধু হাত কাটা ছেলেটা ফিট হয়ে গেছে।

গুলি টুলি লাগেনি তো?

না।

পানি আন, পানি আন—

খুব ধীরে ধীরে বুক থেকে একটা আটকে থাকা শ্বাস বের করে আমি আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকালাম। হাজার হাজার মানুষ গিজগিজ করছে। রক্তে মাখামাখি ডাকাত সর্দারকে ধরে সরিয়ে নিচ্ছে, চেঁচামেচি হৈ চৈ দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেছে।

কে একজন আমাদের পিঠে হাত দিয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। রবিনকে আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওর মাথায় মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছে বাড়ির মেয়েরা। চারদিকে ভিড়। আমরা ওকে ঘিরে বসলাম, অন্যেরা ঠেলেঠুলে আমাদের জায়গা করে দিল।

রবিন হঠাৎ চোখ খুলল। খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে সবকিছু মনে করে নিল। এদিক সেদিক তাকিয়ে আমাদের দেখে হঠাৎ উঠে বসল তারপর খপ করে আমার হাত আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, মরে গেছে! মরে গেছে লোকটা?

আমি বললাম, না।

রবিন একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল। এই প্রথম আমি রবিনকে কাঁদতে দেখলাম। যখন কাঁদার কোন অর্থ নেই— প্রয়োজন নেই— কারণ নেই।

আমরা চুপচাপ বসে রইলাম, বাহিরে পুলিস এসে গেছে। মিশু আর সলিলের গলার স্বর শুনতে পেলাম। মিশুর আব্বাও এসেছেন মনে হয়। খবর পেয়ে আমাদের খোঁজে এসেছিলেন, এখন একেবারে ঘটনাস্থলে এসে পড়েছেন। সবাই মিলে ভিতর আসছে আমাদের কাছে, হারিকেন হাতে পথ দেখিয়ে আনছে ইসমাইল খাঁ— মিশুর আব্বাকে খাকী ঝকঝকে পোশাক দেখে ভারি একটা বিগলিত ভাব। পিছনে রাইফেল হাতে অনেক পুলিস, তার পিছনে শুধু মানুষ।

সলিল আর মিশু উঠানের মাঝে থেকে এক ছুট দিল আমাদের দিকে চিৎকার করতে করতে। আমরা চুপ করে বসে থাকলাম, রবিন তখনো মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে সব চুকেবুকে গেল! আমি আস্তে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস!

পরিশিষ্ট

এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর আমরা সবাই ভেবেছিলাম সব পত্রিকায় বুঝি আমাদের ছবি-টবি ছাপা হবে। কিন্তু কিছুই হল না। কয়েকটা পত্রিকায় ভিতরের দিকে ছোট করে লেখা হল, 'দুর্ধর্ষ ডাকাত দল ধৃত' কিন্তু ভিতরে কোথাও আমাদের কথা লিখল না। শুধু একটি পত্রিকায় এক লাইনে লিখেছিল, 'খবরে প্রকাশ কয়েকজন কিশোরের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার দরুন এদের ধরা সম্ভব হয়' আমরা ঐ খবরটুকু কেটে রেখে দিয়েছি, কেউ আসলেই দেখাই।

খবরের কাগজে গুরুত্ব না দিলে কি হবে এ ছোট্ট শহরে কারো ব্যাপারটা জানতে বাকি নেই। স্কুলে গেলে সবাই আড়চোখে তাকায় আর বলাবলি করে, এই ছেলেগুলি, এই ছেলেগুলি। আমরা না শোনার ভান করে গম্ভীর হয়ে হেঁটে যাই। স্যারেরা অবিশ্যি ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেননি — মালেক স্যার তো বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম বলে একদিন আমাদের কান মলে দিলেন, অবিশ্যি হাসতে হাসতে। তবু কানমলা তো কানমলাই!

বাসায় কেউ বেড়াতে এলেই আমাদের দেখতে চায়, আমরা গম্ভীর হয়ে গিয়ে দাঁড়াই। সবাই সাহসের প্রশংসা করে তারপর বেশি সাহসের জন্যে আশঙ্কা প্রকাশ করে। আমাদের উপর এখন সবাই খুব তীক্ষ্ণ নজর রাখে, কখন না আবার পালিয়ে যাই!

যখন কেস শুরু হল তখন আমাদের সাক্ষী দিতে হয়েছিল, সে ভারি একটা মজার দৃশ্য। ডাকাত সর্দার কাঠগড়া থেকে আমাদের দিকে প্রথমে চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল। উকিল যখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সবকিছু জেনে নিল তখন ডাকাত হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল! আমাদের ভারি মজা লেগেছিল দেখে।

ডাকাতগুলির আটবছর দশবছর করে জেল হয়েছে। ওদের নামে নাকি আগেরও অনেক কেস ঝুলে ছিল। এখন সবাই জেলে।

ইসমাইল খাঁ মাঝে মাঝে আমাদের দেখতে আসে। যখনই আসে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে। একবার এনেছিল এক নৌকা আম। সত্যি সত্যি এক নৌকা, এ পাড়ার সবাই মিলে খেয়েও তিন চারদিনে শেষ করতে পারেনি। আরেকবার এনেছিল দুটি রুই মাছ, ছোট মাছটাও আমার থেকে লম্বা, বুকের দিকটা টকটকে লাল, হাতের তালুর মত বড় বড় আঁশ! ওগুলো নাকি ওর নিজের পুকুরের। শেষবার যখন আসে তখন এনেছিল কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি। সে কি মিষ্টি! এখনও মুখে স্বাদ লেগে আছে।

আমরা এখনও ফুটবল খেলি, নৌকা করে ঘুরে বেড়াই আর সবসময় চোখ কান খোলা রাখি, কখন কোথায় কি ঘটে যাবে আর আবার হয়তো আমাদের অ্যাডভেঞ্চারে বের হতে হবে। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল এখনও সেরকম কিছু ঘটল না। আমরা অবিশ্যি আশা ছাড়িনি, অপেক্ষা করে আছি একটা না একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে। রবিন অবিশ্যি অন্যরকম বলে, সে নাকি আরও কিছুদিন দেখবে তারপরেও যদি কিছু না হয় তাহলে নিজেই অ্যাডভেঞ্চার তৈরি করে নেবে। বুদ্ধিটা খারাপ না, আমাদেরও মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তাই বুঝি করতে হবে